Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

আধুনিক নারীবাদ (feminism) ও ইসলামি নারীত্ব: তুলনামূলক বিশ্লেষণ

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাও: সাইফুদ্দীন শাকিল

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

সুমাইয়া জান্নাত

রোলঃ 23100120501

৩১ মে, ২০২৬ ইং

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

আধুনিক নারীবাদ (feminism) ও ইসলামি নারীত্ব: তুলনামূলক বিশ্লেষণ

এই রিপোর্ট টি ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসার ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজের একটি আনুসাঙ্গিক রিপোর্ট।

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাও: সাইফুদ্দীন শাকিল

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

সুমাইয়া জান্নাত

রোলঃ 23100120501

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

প্রত্যয়ন পত্র

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, “ আধুনিক নারীবাদ (feminism) ও ইসলামি নারীত্ব: তুলনামূলক বিশ্লেষণ ” বিষয়ক গবেষণাপত্র টি আমার তত্ত্বাবধানে ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ ডিপার্টমেন্ট থেকে সুমাইয়া জান্নাত, আইডিঃ 23100120501 বিচক্ষনতার সাথে সম্পন্ন করেছেন।

(স্বাক্ষর)

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাও: সাইফুদ্দীন শাকিল
রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

(স্বাক্ষর)

এক্সটারনালঃ

মাও: আলী হাসান
তাজবীদ ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

ঘোষণাপত্র

আমি নিম্নস্বাক্ষরকারী এ মর্মে ঘোষণা করছি যে, " আধুনিক নারীবাদ (feminism) ও ইসলামি নারীত্ব: তুলনামূলক বিশ্লেষণ " শিরোনামে এই গবেষণাপত্র ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসার (Islamic Online Madrasah – IOM) ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের মাও: সাইফুদ্দীন শাকিল উস্তাদের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ও নির্দেশনায় সম্পন্ন করেছি। অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে কোন প্রকার ডিগ্রি/ডিপ্লোমা অর্জনের জন্য বা প্রকাশের জন্য গবেষণাপত্র সম্পূর্ণ কিংবা এর অংশবিশেষ উপস্থাপন করা হয়নি।

আমি ঘোষণা করছি যে, এই গবেষণা কর্মটি আমার নিজস্ব প্রচেষ্টায় প্রস্তুত করা হয়েছে, যেখানে প্রয়োজন অনুসারে বিভিন্ন উৎস থেকে সংগৃহীত তথ্য ব্যবহার করা হয়েছে এবং সেগুলো যথাযথভাবে তথ্যসূত্রে উল্লেখ করা হয়েছে।

Sumaiya Jannat

(স্বাক্ষর)

তারিখঃ

৩১ মে, ২০২৬ ইং

সুমাইয়া জান্নাত

আইডিঃ 23100120501

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা।

সূচিপত্র

ভূমিকা 6

নারী ফিতরাত 7

নারী ও পুরুষের ফিতরাগত পার্থক্য 8

নারীবাদের সূচনা 9

নারীবাদের উৎপত্তি ও বিকাশ 10

নারীবাদীদের কার্যক্রম, স্লোগান ও ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গি 12

মুসলিম বিশ্বে নারীবাদী চিন্তাধারার প্রবেশ ও এর প্রভাব 14

স্বাধীনতা নাকি ফাঁদ? 16

রানী চাকরানী 18

শেয়াল মুরগির স্বাধীনতা চায় 21

নারী ও পুরুষ: সমতা নাকি পরিপূরকতা? 22

সমান অধিকার কথাটাই হাস্যকর! 25

সেক্যুলার বনাম ইসলামে নারীর সম্মান 27

নারীর গৃহে অবস্থান: কারাগার নয়, মর্যাদা ও নিরাপত্তার আশ্রয় 29

ফিরে দেখা, ইসলাম পূর্বে নারীর অবস্থা 35

ইসলাম আগমনের পর কুর'আনের আলোকে নারীর মর্যাদা ও অধিকার 39

বিভিন্ন ধর্মে নারীর অবস্থা ও অধিকার 51

তুলনামূলক বিশ্লেষণ 59

মুক্তির পথ 61

শেষ কথা 67

তথ্যসূত্র 69

কৃতজ্ঞতা ♡ 69

بسم الله الرحمن الرحيم

"পরম করুনাময়, অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে"

এই গবেষণার উদ্দেশ্য আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন করা। লক্ষ্য হচ্ছে ইসলামে নারীর সম্মান মর্যাদা ও আল্লাহর দেয়া অধিকার সম্পর্কে পরিচয় কিংবা মনে করিয়ে দেওয়া। অন্যদিকে আধুনিক বিশ্বে সবচেয়ে আলোচিত মতবাদগুলোর একটি নারীবাদ (Feminism) সম্পর্কে আলোচনা ও তাদের মৌলিক দর্শন, লক্ষ্য, নারী-পুরুষ সম্পর্ক, পরিবারব্যবস্থা, স্বাধীনতা ও অধিকার সম্পর্কে পর্যালোচনা করা।

ভূমিকা

يأَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِى خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَحدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءَ : وَاتَّقُوا اللهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالأَرْحَامَ : إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

অর্থঃ ‘হে মানব সমাজ! তোমরা তোমাদের পালনকর্তাকে ভয় কর, যিনি তোমাদেরকে এক ব্যক্তি থেকে সৃষ্টি করেছেন এবং যিনি তার থেকে তার সঙ্গীনীকে সৃষ্টি করেছেন; আর বিস্তার করেছেন তাদের দু'জন থেকে অগণিত পুরুষ ও নারী। আর আল্লাহকে ভয় কর, যাঁর নামে তোমরা একে অপরের নিকট চেয়ে থাক এবং আত্মীয় জ্ঞাতিদের ব্যাপারে সতর্কতা অবলম্বন কর। নিশ্চয় আল্লাহ তোমাদের ব্যাপারে সচেতন রয়েছেন। [1]

আল্লাহ তা'আলা মানবজাতিকে সমস্ত সৃষ্টি জগতের সর্বশ্রেষ্ঠ জাতি হিসাবে সৃষ্টি করেছেন। নর ও নারীর মাধ্যমে এ জাতিকে পূর্ণতা দান করেছেন। এবং উভয়কেই মর্যাদার উচ্চাসনে সমাসীন করেছেন কাউকে কোন অংশে খাটো করেননি। দায়িত্ব অর্পণের ক্ষেত্রেও সমতা বজায় রেখেছেন। জগতের ব্যবস্থাপনা ঠিক রাখার স্বার্থে দৈহিক গঠন, শারীরিক সামর্থ্য ও মানসিক পরিপক্কতার প্রতি লক্ষ্যরেখে নারীর উপর অতিরিক্ত দায়িত্বের বোঝা চাপিয়ে দেওয়া হয়নি। আবার অধিকার ও মর্যাদার ক্ষেত্রেও তার প্রাপ্য অধিকার ও মর্যাদা থেকে বঞ্চিত করা হয়নি। বরং যথাযথ অধিকার নিশ্চিত করা হয়েছে।

কিন্তু পরিতাপের বিষয় হচ্ছে, আজকের নারী সমাজ তা অনুধাবন করতে পারছে না। পাশ্চাত্যের ক্রমাগত ইসলাম বিদ্বেষী অপপ্রচার ও মগজ ধোলাইয়ের শিকার হয়ে তারা ইসলামী আদর্শ থেকে দূরে সরে যাচ্ছে। নারী স্বাধীনতা ও নারীর অধিকার নামে পাশ্চাত্যের লাগামহীন জীবন আর তার ভয়াবহ রুপই হলো নারীবাদ। নারীবাদের ভয়াল থাবা আমাদের উম্মাহর নারীদের ধ্বংসের দিকে নিয়ে যাচ্ছে।

নারীবাদের বিভিন্ন ধারা মুসলিম সমাজেও প্রভাব বিস্তার করছে। ফলে নারী অধিকার, স্বাধীনতা, পারিবারিক ভূমিকা এবং সামাজিক দায়িত্বের মতো বিষয়গুলোতে আধুনিক

1. সূরা আন নিসা, ৪:১

নারীবাদ ও ইসলামি দৃষ্টিভঙ্গির মধ্যে তুলনামূলক আলোচনা গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠছে। একদিকে নারীবাদ নারী-পুরুষের সমতা ও ব্যক্তিস্বাধীনতার উপর গুরুত্বারোপ করে, অন্যদিকে ইসলাম ন্যায়বিচার, পারিবারিক স্থিতিশীলতা এবং মানবিক মর্যাদার ভিত্তিতে নারী-পুরুষের ভূমিকা নির্ধারণ করে।

এই গবেষণায় আধুনিক নারীবাদ এবং ইসলামি নারীত্বের ধারণা, নারীবাদের উদ্দেশ্য, মৌলিক নীতিমালা, নারী-পুরুষ সম্পর্ক, পরিবারব্যবস্থা এবং সামাজিক ভূমিকা সম্পর্কে তুলনামূলক বিশ্লেষণ উপস্থাপন করার চেষ্টা করবো ইন শা আল্লাহ।

নারী ফিতরাত

ফিতরাত (فطرة) শব্দটি আরবি "ফিতরাহ" (Fitrah) থেকে এসেছে।

যার অর্থ হলো: মানুষের স্বাভাবিক প্রকৃতি, সহজাত বৈশিষ্ট্য, আল্লাহপ্রদত্ত প্রাকৃতিক, গঠন ও প্রবণতা কিংবা জন্মগত স্বভাব।

ইসলামি পরিভাষায় ফিতরাত বলতে সেই স্বাভাবিক ও বিশুদ্ধ প্রকৃতিকে বোঝায়, যার উপর আল্লাহ মানুষকে সৃষ্টি করেছেন।

আল্লাহ তাআলা বলেন:

فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا ۚ فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا ۚ

"অতএব তুমি একনিষ্ঠভাবে নিজেকে দ্বীনের উপর প্রতিষ্ঠিত রাখো। এটাই আল্লাহ ফিতরাত, যার উপর তিনি মানুষকে সৃষ্টি করেছেন।"[2]

ফিতরাত হলো আল্লাহপ্রদত্ত মানুষের সহজাত ও স্বাভাবিক প্রকৃতি, যার মাধ্যমে তার মৌলিক প্রবণতা, বৈশিষ্ট্য ও জীবনযাপনের স্বাভাবিক ধারা প্রকাশ পায়। নারী ফিতরাত বলতে নারীর সেই সহজাত ও স্বাভাবিক বৈশিষ্ট্যসমূহ, যা আল্লাহ তার সৃষ্টিগত প্রকৃতির অংশ হিসেবে দিয়েছেন। যেমন— মমতা, কোমলতা, আবেগীয় সংবেদনশীলতা, লালন-পালনের প্রবণতা, মাতৃত্বের সক্ষমতা ইত্যাদি।

এবং তার জন্মগত ও প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্যসমূহকে বোঝায়, যা তার ব্যক্তিত্ব, আবেগ, দায়িত্ববোধ এবং সামাজিক ভূমিকার সঙ্গে সম্পর্কিত।

[2] সূরা আর-রুম, ৩০:৩০

নারী ও পুরুষের ফিতরাগত পার্থক্য

ইসলামি দৃষ্টিভঙ্গি অনুযায়ী নারী ও পুরুষ উভয়েই আল্লাহর সৃষ্টি এবং মানবিক মর্যাদা, ইবাদত ও নৈতিক দায়িত্বের ক্ষেত্রে সমান। তবে তাদের শারীরিক গঠন, মানসিক প্রবণতা এবং আবেগীয় বৈশিষ্ট্যের ক্ষেত্রে কিছু স্বাভাবিক ও ফিতরাগত পার্থক্য বিদ্যমান। ইসলাম এই পার্থক্যগুলোকে শ্রেষ্ঠত্ব বা হীনমন্যতার মানদণ্ড হিসেবে নয়, বরং মানবজীবনের ভারসাম্য ও পারস্পরিক পরিপূরকতার অংশ হিসেবে বিবেচনা করে।

সাধারণভাবে নারীর মধ্যে মমতা, কোমলতা, আবেগীয় সংবেদনশীলতা, ধৈর্য এবং লালন-পালনের প্রবণতা তুলনামূলকভাবে বেশি পরিলক্ষিত হয়, যা মাতৃত্ব ও পারিবারিক বন্ধন রক্ষার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। অন্যদিকে পুরুষের মধ্যে নেতৃত্বদান, শারীরিক সক্ষমতা, ঝুঁকি গ্রহণ এবং বহির্মুখী দায়িত্ব পালনের প্রবণতা তুলনামূলকভাবে বেশি দেখা যায়। এসব বৈশিষ্ট্য একেবারে নিরঙ্কুশ নয়; বরং ব্যক্তি ভেদে এর তারতম্য হতে পারে। তবে সামগ্রিকভাবে মানবসমাজের স্বাভাবিক কাঠামোতে এই প্রবণতাগুলো বিদ্যমান বলে ইসলাম স্বীকার করে।

আধুনিক নারীবাদের কিছু ধারা নারী ও পুরুষের মধ্যকার পার্থক্যকে মূলত সামাজিক ও সাংস্কৃতিক নির্মাণ হিসেবে ব্যাখ্যা করলেও ইসলামি দৃষ্টিভঙ্গি মনে করে যে নারী ও পুরুষের কিছু মৌলিক বৈশিষ্ট্য সৃষ্টিগত ও ফিতরাগত। তাই ইসলাম নারী ও পুরুষের মধ্যে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার ওপর গুরুত্বারোপ করে, যেখানে প্রত্যেককে তার স্বাভাবিক যোগ্যতা, দায়িত্ব ও সক্ষমতার আলোকে মূল্যায়ন করা হয়। এই দৃষ্টিকোণ থেকে নারী-পুরুষের পার্থক্য বৈষম্যের কারণ নয়; বরং সমাজ, পরিবার এবং মানবজীবনের পূর্ণতা অর্জনের জন্য একটি স্বাভাবিক ও প্রয়োজনীয় বাস্তবতা।

নারীবাদের সূচনা

Feminism বা নারীবাদ" শব্দটি লাটিন শব্দ "Femina" শব্দ থেকে এসেছে। "Femina" এর অর্থ অচ্ছে, "The Woman"।

নারীবাদ আধুনিক বিশ্বের অন্যতম প্রভাবশালী সামাজিক ও রাজনৈতিক আন্দোলন হিসেবে পরিচিত। এর উৎপত্তি মূলত ইউরোপে, যেখানে অষ্টাদশ ও ঊনবিংশ শতাব্দীতে ব্যক্তি-স্বাধীনতা, মানবাধিকার এবং সমতার ধারণা ব্যাপকভাবে প্রসার লাভ করে। ধারণা করা হয়, ১৮৩৭ খ্রিস্টাব্দে ফরাসি দার্শনিক ও ইউটোপীয় সমাজবাদী Charles Fourier সর্বপ্রথম 'নারীবাদ' (Feminism) শব্দটির আনুষ্ঠানিক ব্যবহার করেন। পরবর্তীতে "নারীবাদ" এবং "নারীবাদী" শব্দ দুটি ১৮৭২ সালে ফ্রান্স ও নেদারল্যান্ডসে, ১৮৯০ সালে যুক্তরাজ্যে এবং ১৯১০ সালে যুক্তরাষ্ট্রে প্রচলিত হয়। অক্সফোর্ড ইংরেজি অভিধান অনুযায়ী "Feminist" শব্দটির ব্যবহার শুরু হয় ১৮৫২ সালে এবং "Feminism" শব্দটি ১৮৯৫ সালে অভিধানে অন্তর্ভুক্ত হয়।

প্রথমদিকে নারীবাদ মূলত নারীদের সামাজিক, রাজনৈতিক ও আইনি অধিকার প্রতিষ্ঠার আন্দোলন হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে। দীর্ঘদিন ধরে নারীরা শিক্ষা, সম্পত্তির মালিকানা, কর্মসংস্থান এবং রাজনৈতিক অংশগ্রহণের ক্ষেত্রে নানা বৈষম্যের শিকার হওয়ায় এসব অধিকার আদায়ের দাবিতে বিভিন্ন আন্দোলন গড়ে ওঠে। অধিকাংশ পাশ্চাত্য ঐতিহাসিকের মতে, ইতিহাসে নারীর অধিকার অর্জনের লক্ষ্যে পরিচালিত সব আন্দোলনই নারীবাদের অন্তর্ভুক্ত, যদিও সেসব আন্দোলনের কর্মীরা নিজেদেরকে নারীবাদী হিসেবে পরিচয় না-ও দিয়ে থাকতে পারেন। তবে কিছু গবেষক মনে করেন, "নারীবাদ" শব্দটি মূলত আধুনিক যুগের নারী-অধিকারভিত্তিক আন্দোলন এবং তার উত্তরসূরি ধারাগুলোর ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য।

আধুনিক পাশ্চাত্য নারীবাদী আন্দোলনের বিকাশ সাধারণত তিনটি "তরঙ্গ" বা পর্যায়ে বিভক্ত। প্রথম তরঙ্গ (ঊনবিংশ শতাব্দী থেকে বিংশ শতাব্দীর প্রথমভাগ) নারীদের ভোটাধিকার ও আইনি স্বীকৃতি অর্জনের লক্ষ্যে পরিচালিত হয়। দ্বিতীয় তরঙ্গ, যা ১৯৬০-এর দশকে নারীমুক্তি আন্দোলনের মাধ্যমে শক্তিশালী রূপ লাভ করে, নারীর সামাজিক,

সাংস্কৃতিক ও আইনগত সমতার প্রশ্নকে সামনে নিয়ে আসে। তৃতীয় তরঙ্গ ১৯৯০-এর দশক থেকে শুরু হয়ে লিঙ্গভিত্তিক প্রচলিত সামাজিক মূল্যবোধ, পরিচয় ও ক্ষমতার কাঠামোকে নতুনভাবে মূল্যায়নের আহ্বান জানায়। এভাবে নারীবাদ একটি সীমিত অধিকার আন্দোলন থেকে ক্রমান্বয়ে বিস্তৃত সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক মতাদর্শে পরিণত হয়, যা আজ বিশ্বব্যাপী নারী অধিকার ও লিঙ্গসমতার বিভিন্ন দাবির ভিত্তি হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে।

তবে নারীবাদ একটি একক মতবাদ নয়; বরং এটি বিভিন্ন ধারা ও চিন্তাধারার সমষ্টি, যা সময় ও সমাজভেদে ভিন্ন রূপ ধারণ করেছে।

নারীবাদের উৎপত্তি ও বিকাশ

বিশ্বে নারী আন্দোলনের ইতিহাস খুব প্রাচীন না হলেও এর শিকড় আধুনিক যুগের সামাজিক ও রাজনৈতিক পরিবর্তনের সঙ্গে গভীরভাবে সম্পর্কিত। সাধারণভাবে অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগ, বিশেষত ১৭৮৯ সালের ফরাসি বিপ্লবকে আধুনিক নারীবাদী আন্দোলনের সূচনাকাল হিসেবে বিবেচনা করা হয়। যদিও ষোড়শ ও সপ্তদশ শতাব্দীতে নারীর অধিকার ও মর্যাদা নিয়ে কিছু বিচ্ছিন্ন প্রবন্ধ, সাহিত্যকর্ম এবং বুদ্ধিবৃত্তিক আলোচনা দেখা যায়, তবুও সংগঠিত নারী আন্দোলনের ভিত্তি মূলত ফরাসি বিপ্লবের মধ্য দিয়েই রচিত হয়।
ফরাসি বিপ্লবের মূল স্লোগান ছিল সাম্য, মৈত্রী ও স্বাধীনতা। এই আদর্শ ফরাসি নারীদের গভীরভাবে প্রভাবিত করে এবং তারা নিজেদের ব্যক্তিগত ও পারিবারিক জীবনের স্বাধীনতার দাবিকে বিপ্লবের বৃহত্তর স্বাধীনতার আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত করেন। বিপ্লবে অংশগ্রহণকারী নারীরা কেবল রাজতন্ত্রের বিরোধিতা করেননি; বরং পিতৃতান্ত্রিক সামাজিক কাঠামোর সমালোচনা করে নারীর অধিকার প্রতিষ্ঠার দাবিও উত্থাপন করেন। কিন্তু ১৭৯১ সালের নতুন সংবিধানে সীমিত ভোটাধিকার শুধু পুরুষদের জন্য স্বীকৃত হয় এবং নারীদের সেই অধিকার থেকে বঞ্চিত রাখা হয়। একইভাবে নবগঠিত ফরাসি সংসদে 'পুরুষের অধিকার ঘোষণা' (Declaration of the Rights of Man) গৃহীত

হলেও নারীর অধিকার সেখানে স্থান পায়নি। এই বৈষম্যের বিরুদ্ধে নারীরা তীব্র প্রতিবাদ গড়ে তোলেন।

এই সময় নারী অধিকার আন্দোলনের অন্যতম সাহসী কণ্ঠ ছিলেন অলিম্প দ্য গুজ (Olympe de Gouges)। তিনি প্রশ্ন তুলেছিলেন—যদি নারীদের ফাঁসির মঞ্চে ওঠার অধিকার থাকে, তবে সংসদে প্রবেশের অধিকার থাকবে না কেন? তাঁর এই প্রতিবাদ শেষ পর্যন্ত তাঁকে মৃত্যুদণ্ডের মুখোমুখি করে। এ ঘটনা নারীর রাজনৈতিক অধিকার অর্জনের সংগ্রামের একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রতীক হিসেবে বিবেচিত হয়।

একই সময়ে ইউরোপীয় আলোকায়ন যুগের বিখ্যাত চিন্তাবিদদের অধিকাংশই নারী-পুরুষের সমানাধিকার বিষয়ে সুস্পষ্ট অবস্থান গ্রহণ করেননি। তাঁরা সাধারণত নারীকে আবেগপ্রবণ, পারিবারিক ভূমিকা পালনকারী এবং পুরুষের তুলনায় কম যুক্তিবাদী হিসেবে উপস্থাপন করতেন। এই প্রেক্ষাপটে Mary Wollstonecraft ১৭৯২ সালে *A Vindication of the Rights of Woman* গ্রন্থ রচনা করেন, যা পরবর্তী নারীবাদী চিন্তা ও আন্দোলনের ওপর গভীর প্রভাব বিস্তার করে। অনেক গবেষকের মতে, এই গ্রন্থের মাধ্যমেই উদারপন্থী নারীবাদের বুদ্ধিবৃত্তিক ভিত্তি সুসংহত হয়।

ফ্রান্সে শুরু হওয়া নারী আন্দোলনের প্রভাব দ্রুত ইউরোপ ও আমেরিকায় ছড়িয়ে পড়ে। ১৮৩০-এর দশকে ইংল্যান্ডে নারীরা বিভিন্ন অধিকার আদায়ের দাবিতে সংগঠিতভাবে আন্দোলন শুরু করেন। অন্যদিকে যুক্তরাষ্ট্রে ১৮৫৭ সালের ৮ মার্চ নারী শ্রমিকদের আন্দোলন নারী অধিকার সংগ্রামের ইতিহাসে একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা হিসেবে বিবেচিত হয়। পরবর্তীকালে ১৯১০ সালে ডেনমার্কের কোপেনহেগেনে অনুষ্ঠিত দ্বিতীয় আন্তর্জাতিক সমাজতান্ত্রিক নারী সম্মেলনে জার্মান সমাজতান্ত্রিক নেত্রী Clara Zetkin ৮ মার্চকে আন্তর্জাতিক নারী দিবস হিসেবে পালনের প্রস্তাব উত্থাপন করেন। এর ধারাবাহিকতায় ১৯১৪ সাল থেকে ৮ মার্চ আন্তর্জাতিক নারী দিবস হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করে।

আধুনিক নারীবাদী আন্দোলনের বিকাশ সাধারণত তিনটি পর্যায় বা "তরঙ্গ"-এ বিভক্ত। প্রথম তরঙ্গ মূলত নারীদের ভোটাধিকার, শিক্ষা এবং আইনি স্বীকৃতির দাবিকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠে। দ্বিতীয় তরঙ্গ, যা ১৯৬০-এর দশকে শক্তিশালী রূপ লাভ করে, নারীর সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও অর্থনৈতিক বৈষম্যের প্রশ্নকে সামনে নিয়ে আসে। এ সময় অনেক নারীবাদী চিন্তাবিদ পিতৃতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থা, লিঙ্গভিত্তিক ভূমিকা এবং ক্ষমতার কাঠামোর সমালোচনা করেন। তাদের মতে, কেবল কিছু আইনি অধিকার অর্জনের

মাধ্যমে নারী নির্যাতন বা লিঙ্গবৈষম্যের অবসান সম্ভব নয়; বরং এর জন্য সমাজের প্রচলিত মূল্যবোধ, মানসিকতা এবং আর্থ-সামাজিক কাঠামোর মৌলিক পরিবর্তন প্রয়োজন।

১৯৯০-এর দশক থেকে নারীবাদের তৃতীয় তরঙ্গের সূচনা হয়, যা অনেক ক্ষেত্রে উত্তর-নারীবাদ (Post-feminism) নামেও পরিচিত। এই পর্যায়ে নারীর পরিচয়, সংস্কৃতি, যৌনতা, ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য এবং বহুমাত্রিক অভিজ্ঞতার বিষয়গুলো অধিক গুরুত্ব পায়। তৃতীয় তরঙ্গের নারীবাদীরা মনে করেন যে নারীদের অভিজ্ঞতা একরৈখিক নয়; বরং জাতি, শ্রেণি, সংস্কৃতি ও সামাজিক অবস্থানের ভিন্নতার কারণে নারীদের সমস্যা ও চাহিদাও ভিন্ন হতে পারে। ফলে নারীবাদ কেবল নারী-পুরুষ সমতার আন্দোলন নয়, বরং সামাজিক ন্যায়বিচার, পরিচয় ও ক্ষমতার সম্পর্ক পুনর্বিবেচনার একটি বিস্তৃত বুদ্ধিবৃত্তিক ও রাজনৈতিক ধারায় পরিণত হয়েছে।

নারীবাদীদের কার্যক্রম, স্লোগান ও ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গি

আধুনিক যুগে নারীবাদী আন্দোলনের কার্যক্রম ক্রমাগত বিস্তৃত হচ্ছে। তারা বিভিন্ন সময়ে আন্দোলন ও প্রচারণার মাধ্যমে নারীর ভোটাধিকার, শিক্ষা গ্রহণ, চাকরির সুযোগ, সমান মজুরি, সম্পত্তির মালিকানা, রাজনৈতিক অংশগ্রহণ, বিবাহ ও পারিবারিক বিষয়ে সমঅধিকার, মাতৃত্বকালীন ছুটি, গর্ভনিরোধ, আইনি গর্ভপাত, যৌন হয়রানি ও গার্হস্থ্য সহিংসতার বিরুদ্ধে আইনগত সুরক্ষাসহ নানা দাবিকে সামনে এনেছে। সাম্প্রতিক সময়ে সমকামিতা, ট্রান্সজেন্ডার মতবাদ এবং লিঙ্গ পরিচয়ের পরিবর্তনকে স্বীকৃতি দেওয়ার বিষয়ও তাদের কার্যক্রমের অংশে পরিণত হয়েছে। ইসলামী দৃষ্টিকোণ থেকে এসব দাবির একটি বড় অংশ কুরআন ও সুন্নাহর নির্ধারিত জীবনব্যবস্থা ও নৈতিকতার সঙ্গে সাংঘর্ষিক বলে বিবেচিত হয়। যদিও অনেক পশ্চিমা গবেষক নারীবাদী আন্দোলনকে নারীর অধিকার প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক শক্তি হিসেবে চিহ্নিত করেন, ইসলামী চিন্তাবিদদের মতে নারীবাদের ভিত্তি ইসলামী বিশ্বদর্শনের পরিবর্তে পাশ্চাত্য চিন্তা ও মূল্যবোধের উপর প্রতিষ্ঠিত।

নারীবাদী আন্দোলনের মূল ভিত্তি হলো পাশ্চাত্যের স্বাধীনতা, সমতা ও উন্নয়নের ধারণা।

তাদের প্রথম স্লোগান: প্রথমেই কুর'আনের একটি আয়াত মনে করিয়ে দিতে চাই। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাআ'লা কুর'আনে বলেছেন,

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ

"পুরুষরা নারীদের উপর দায়িত্বশীল (অভিভাবক), কারণ আল্লাহ তাদের একজনকে অন্যজনের উপর কিছু বৈশিষ্ট্য ও মর্যাদা প্রদান করেছেন।"[3]

আল্লাহ তা'য়ালা যা দ্বারা কাউকে কারোর উপর শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছেন, তার আকাঙ্ক্ষায় পরস্পর হিংসা বিদ্বেষে লিপ্ত হতে নিষেধ করেছেন।[4]

কিন্তু নারীবাদীদের প্রথম স্লোগানই হচ্ছে; নারী স্বয়ংসম্পূর্ণ, তার উপর কারো কর্তৃত্ব থাকবে না এবং সে কোনো অভিভাবকত্বের অধীন হবে না। এই ধারণা অনুসারে পরিবার, স্বামী, সন্তান ও সামাজিক দায়িত্বকে অনেক সময় ব্যক্তিস্বাধীনতার প্রতিবন্ধক হিসেবে উপস্থাপন করা হয়। ফলে আল্লাহপ্রদত্ত অভিভাবকত্ব, পারিবারিক দায়িত্ব, পর্দা ও শালীনতার বিধানকে অনেক নারীবাদী চিন্তাবিদ পরাধীনতার প্রতীক হিসেবে তুলে ধরে।

দ্বিতীয় স্লোগান হলো; নারী-পুরুষের পূর্ণ সমতা ও প্রতিযোগিতা। তাদের মতে নারী ও পুরুষের মধ্যে অধিকার, দায়িত্ব ও সামাজিক ভূমিকার কোনো মৌলিক পার্থক্য থাকা উচিত নয়। কিন্তু ইসলাম নারী-পুরুষকে অভিন্ন নয় বরং পরস্পরের পরিপূরক হিসেবে বিবেচনা করে। ইসলামে ন্যায় ও ইনসাফকে মানদণ্ড ধরা হয়েছে, সমতাকে নয়। এ কারণে উত্তরাধিকার, ভরণ-পোষণ, পারিবারিক দায়িত্ব ও সামাজিক কর্তব্যের ক্ষেত্রে নারী ও পুরুষের জন্য ভিন্ন বিধান নির্ধারণ করা হয়েছে, যা ইসলামী দৃষ্টিতে বৈষম্য নয় বরং ন্যায়বিচারের বহিঃপ্রকাশ।

নারীবাদের তৃতীয় গুরুত্বপূর্ণ স্লোগান হলো; অর্থনৈতিক স্বাবলম্বিতাই নারীর সম্মান ও মর্যাদার একমাত্র পথ। এই ধারণা অনুযায়ী কর্মক্ষেত্রে অংশগ্রহণ ও অর্থ উপার্জনই নারীর সফলতার প্রধান মানদণ্ড। কিন্তু ইসলামী দৃষ্টিকোণ থেকে নারীর মর্যাদা কেবল অর্থনৈতিক উৎপাদনশীলতার উপর নির্ভরশীল নয়; বরং মাতৃত্ব, পরিবার গঠন, সন্তান প্রতিপালন, স্বামী-সন্তানের প্রতি দায়িত্বশীলতা এবং নৈতিক চরিত্র নারীর মর্যাদার গুরুত্বপূর্ণ উপাদান।

ইসলাম নারীকে সমাজের একটি অপরিহার্য স্তম্ভ হিসেবে মূল্যায়ন করে এবং পরিবারকে সভ্যতার ভিত্তি হিসেবে বিবেচনা করে। তাই ইসলামে মাতৃত্ব ও পরিবার পরিচালনার

---

3. সূরা আন-নিসা, ৪:৩৪

4. সূরা আন-নিসা ৩৪ নং আয়াতের তাফসীর থেকে নেয়া। (তাফসীরে তাওযীহুল কুরআন, প্রথম খন্ড)

দায়িত্বকে তুচ্ছ বা অনুৎপাদনশীল কাজ হিসেবে দেখা হয় না; বরং এগুলোকে অত্যন্ত মর্যাদাপূর্ণ দায়িত্ব হিসেবে গণ্য করা হয়।
ইসলামের দৃষ্টিতে নারী ও পুরুষ একে অপরের প্রতিদ্বন্দ্বী নয়; বরং তারা পরস্পরের সহযোগী ও পরিপূরক। তাদের সম্পর্ক প্রতিযোগিতা, আধিপত্য কিংবা সংঘাতের নয়; বরং ভালোবাসা, দায়িত্ব, সহমর্মিতা ও পারস্পরিক সহযোগিতার। এ কারণেই আল্লাহ তা'আলা কুরআনে নারী ও পুরুষকে একে অপরের 'পোশাকস্বরূপ' বলে আখ্যায়িত করেছেন। তিনি বলেন;

هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَأَنتُمْ لِبَاسٌ لَّهُنَّ

অর্থাৎ, "তারা (স্ত্রীরা) তোমাদের জন্য পোশাকস্বরূপ এবং তোমরা (স্বামীরা) তাদের জন্য পোশাকস্বরূপ।"[5]
সুবহান-আল্লহ্, এই আয়াত পারস্পরিক নির্ভরতা, সুরক্ষা ও পরিপূরকতার সর্বোত্তম প্রকাশ।

মুসলিম বিশ্বে নারীবাদী চিন্তাধারার প্রবেশ ও এর প্রভাব

নারীবাদের ইতিহাস বিশ্লেষণ করতে গিয়ে অনেক গবেষক ও চিন্তাবিদ উল্লেখ করেছেন যে ইউরোপে নারীর অধিকার আন্দোলনের জন্ম হয়েছিল একটি বিশেষ সামাজিক ও ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটে। সে সময় ইউরোপীয় সমাজে নারীরা শিক্ষা, সম্পত্তির অধিকার, রাজনৈতিক অংশগ্রহণ এবং সামাজিক মর্যাদার ক্ষেত্রে নানা ধরনের বৈষম্যের শিকার ছিল। এই পরিস্থিতির প্রেক্ষিতেই নারীবাদী আন্দোলনের উত্থান ঘটে।
তবে ইউরোপীয় সমাজে নারীর অধিকার প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম যে বাস্তবতার মধ্যে জন্ম নিয়েছিল, মুসলিম সমাজের ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট সর্বদা তার অনুরূপ ছিল না। ইসলাম তার জন্মলগ্ন থেকেই নারীকে মানবিক মর্যাদা, সম্পত্তির অধিকার, উত্তরাধিকার, শিক্ষা গ্রহণের সুযোগ এবং বিবাহে মতামত প্রদানের অধিকার প্রদান করেছে। সামাজিক মর্যাদা ও অধিকারের বিষয়ে যারপরনাই গুরুত্ব দিয়েছে। ইতিহাসের পাতায় পাতায় রয়েছে এর জলজ্যান্ত প্রমান।

5. সূরা আল-বাকারা, ২:১৮৭

ইসলাম সপ্তম শতাব্দীতেই নারীকে শিক্ষা, সম্পত্তি, উত্তরাধিকার এবং বিবাহে সম্মতির মতো মৌলিক অধিকার প্রদান করেছিল। ফলে মুসলিম সমাজে নারীর অবস্থান মূল্যায়নের ক্ষেত্রে ইউরোপীয় অভিজ্ঞতাকে একমাত্র মানদণ্ড হিসেবে গ্রহণ করা কতটুকু যৌক্তিক, সে প্রশ্নও বিভিন্ন গবেষণায় উত্থাপিত হয়েছে।

কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে, ইউরোপের নারীবাদী আন্দোলন মুসলিম ভূখণ্ডে কেন ছায়া বিস্তার করলো? মূলত মুসলিম ভূখণ্ডে ইউরোপীয় ঔপনিবেশিক শাসন বিস্তার এবং পশ্চিমা শিক্ষা ব্যবস্থার মাধ্যমে নারীবাদী চিন্তাধারা বিশ্বের বিভিন্ন অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়ে। পশ্চিমা শিক্ষা ব্যবস্থা এবং সাংস্কৃতিক প্রভাবের মাধ্যমে নারীবাদী চিন্তাধারা মুসলিম বিশ্বেও প্রবেশ করে। উপনিবেশিক যুগে অনেক মুসলিম বুদ্ধিজীবী ও শিক্ষিত শ্রেণি পশ্চিমা সভ্যতার বিভিন্ন ধারণা দ্বারা প্রভাবিত হন। ফলে তৎকালীন ইউরোপ নিজেকে পরিশুদ্ধ করতে যেসব মতবাদ তৈরি করেছিলো, উপনিবেশিত মুসলিম জনগোষ্ঠীও সেইসব মতবাদের মধ্যেই নিজেদের মুক্তি খুঁজতে শুরু করেছে। যার নাম দেওয়া হয়েছে প্রগতিশীলতা। এর ফলে নারী অধিকার, স্বাধীনতা, সমতা এবং সামাজিক ভূমিকা নিয়ে নতুন ধরনের আলোচনা শুরু হয়। ধীরে ধীরে পশ্চিমা সমাজে উদ্ভূত অনেক ধারণা মুসলিম সমাজেও গ্রহণযোগ্যতা পেতে থাকে এবং সেগুলোকে আধুনিকতা ও প্রগতিশীলতার অংশ হিসেবে উপস্থাপন করা হয়। এই চিন্তাই মূলত উত্তর ঔপনিবেশিক মুসলিমদের সামগ্রিক উন্নতির পথে সবচেয়ে বড় বাঁধা হিসেবে কাজ করছে, এখন অব্ধি!

মুসলিম বিশ্বে নারীবাদের বিস্তারের ফলে অনেক ক্ষেত্রে পশ্চিমা সমাজের মূল্যবোধ ও জীবনদর্শন মুসলিম সমাজে প্রবেশের সুযোগ পেয়েছে। এর প্রভাবে নারী স্বাধীনতা ও সমতার নামে ইসলাম নির্ধারিত নারী-পুরুষের স্বতন্ত্র ভূমিকা ও দায়িত্ব নিয়ে প্রশ্ন তোলা শুরু হয়। বিশেষ করে পরিবারব্যবস্থা, বিবাহ, মাতৃত্ব এবং পর্দার মতো গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলোক নিয়ে। যার ফলে মুসলিম সমাজে আত্মপরিচয়ের সংকট সৃষ্টি হয়েছে এবং ইসলামের নিজস্ব সমাধান ও আদর্শের পরিবর্তে পশ্চিমা চিন্তাধারার অনুসরণের প্রবণতা বৃদ্ধি পেয়েছে।

আধুনিক নারীবাদের কিছু ধারা নারী ও পুরুষের মধ্যকার স্বাভাবিক ও পরিপূরক সম্পর্কের পরিবর্তে প্রতিযোগিতামূলক সম্পর্কের ধারণাকে উৎসাহিত করে। এর ফলে পরিবারকে সমাজের মৌলিক ভিত্তি হিসেবে দেখার পরিবর্তে ব্যক্তি স্বাধীনতাকে সর্বাধিক গুরুত্ব দেওয়া হয়। এর প্রভাবে পরিবারভিত্তিক মূল্যবোধ দুর্বল হচ্ছে এবং নারী-

পুরুষের দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে ইসলামের ভারসাম্যপূর্ণ দৃষ্টিভঙ্গি উপেক্ষিত হওয়ার আশঙ্কা তৈরি হচ্ছে।

নারী অধিকারের চটকদার বুলিসর্বস্ব এই তথাকথিত মুভমেন্টের দাবি দাওয়াগুলো শুনতে মধুর হলেও এই নামের আড়ালেই রয়েছে অন্ধকার।

স্বাধীনতা নাকি ফাঁদ?

আধুনিক বিশ্বে নারীর স্বাধীনতা, ক্ষমতায়ন এবং অধিকার প্রতিষ্ঠার নামে বিভিন্ন মতবাদ ও আন্দোলনের প্রসার ঘটেছে। বিশেষত সেক্যুলার ও নারীবাদী চিন্তাধারা নারীর মুক্তিকে এমনভাবে উপস্থাপন করে, যেন ব্যক্তিগত স্বাধীনতা, অর্থনৈতিক স্বাবলম্বিতা এবং সামাজিক বাধাহীনতাই নারীর প্রকৃত সফলতার একমাত্র মানদণ্ড। কিন্তু প্রশ্ন হলো, যে স্বাধীনতার এত প্রচার করা হচ্ছে, তা কি সত্যিই নারীর জন্য মুক্তি বয়ে এনেছে, নাকি এটি নতুন ধরনের এক বন্দিত্বের পথ তৈরি করেছে?

সেক্যুলারদের 'অধিকার-ভিত্তিক' সমাজে, নারীর দেহ, বৈশিষ্ট্য, অন্তর-সবই এই খাদক সিস্টেমের টার্গেট। পড়ালেখা কিংবা কর্মক্ষেত্রে, এমনকি সেক্যুলার পরিবারগুলোতেও নারীরা তাদের বস্তুবাদ, টাকা-পয়সা দিয়ে মূল্যায়িত হয়। বস্তুবাদী চাহিদায়, আরেক মানুষের লালসা দিয়ে নারীর মূল্য নির্ধারণ করা হয়, হোক তা কর্পোরেট কোম্পানির মালিক। যৌনবিকৃত নারীরাও অর্থ, সম্পদ ও জনপ্রিয়তার মোহে উন্মাদ হয়ে দৌড়াচ্ছে। তাদেরকে বলা হচ্ছে যে এসবের পেছনে না ছুটলে মুক্তি নেই। কিন্তু নারী কি আসলেই অন্তর থেকে শান্তিতে আছে? আসলেই কি এগুলোর নারীর প্রকৃত পরিচয়? সত্যিই তো, কীভাবে হবে?

এ প্যারাডাইমে নারী খুবই ভঙ্গুর। নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য তাকে নানান ধরনের আজব বেশ ধারণ করতে হয়। তাঁকে তৈরি করতে হয় শিখিয়ে দেওয়া 'আধুনিক', 'সফল' নারীর ব্যক্তিত্ব। বস্তুবাদ ও জাতে ওঠার আগুনে মশকির পালের মতো ঝাঁপিয়ে পড়ছে নারী। শিক্ষা, গণমাধ্যম, মুভি কিংবা বুদ্ধিবৃত্তিক ডকুমেন্টারি-সবকিছুই নারীকে এমন হয়ে উঠতে উৎসাহ দিচ্ছে, চাপ দিচ্ছে। নারী পরে যাচ্ছে এক অসম লড়াইয়ের মাঝে।

এসব আধুনিক নারীরা যখন নারীবাদী কর্মী, বুদ্ধিজীবী ও প্রোপাগেটর হয়ে যায়, তা হলো সবচেয়ে বেশি দুঃখজনক। এমন সব আন্দোলন নিয়ন্ত্রণ করে ইসলামবিদ্বেষী, খোদাদ্রোহী একদল লোক, নৈতিকতার যাদের কোনো বালাই নেই। নিজেদের মতো নৈতিকতা আরোপ করে মানুষের ওপর চাপিয়ে দিয়ে একেই স্বাধীনতা বলে আখ্যা দেয় তারা। আসলে 'আধুনিক' নারীরাই জুলুমের হ্যান্ডমেইড। জুলুম চালানোর মূল অস্ত্র হলো নারীবাদ ও সেক্যুলারিস্ট হিউম্যানিজম। দুটো আদর্শ প্রথমেই আল্লাহর ইচ্ছা ও তাঁর সকল নীতিমালাকে ছুড়ে ফেলে দিয়েছে। (আল্লাহ আমাদেরকে হিফাজত করুন।) মানুষ মাত্রই কোনো অথরিটি চায়, কর্তৃপক্ষ চায়। তাই জালিমরা মানবজাতিকে নিয়ন্ত্রণ করার জন্য আরেক ধরনের পুজা নিয়ে আসে। এ অন্য খোদা হলো সেক্যুলার রাষ্ট্রের সরকার এবং এ বস্তুবাদি পুঁজিবাদী সিস্টেম। এ জুলুম থেকে বাঁচতে চেয়ে আবার এ জালিমদের তত্ত্বই কপচানো অর্থহীন। এভাবে জালিম আরও শক্তিশালী হয়। যেন সিংহ নিজের মুক্তির জন্য খাঁচার দেয়ালে বারবার আঘাত করছে। কিন্তু এভাবে খাঁচা তো ভাঙছেই না; বরং শেকলগুলো আরও শক্ত হয়ে বসে যাচ্ছে। এদিকে তাঁর সংগ্রাম, অপমানজনক সৌন্দর্য দেখে আনন্দ পায় দর্শক, খাঁচার মালিক উপার্জন করে নেয় কিছু অর্থ।

এসব সেক্যুলার নারীবাদী ধারণাগুলো বদলাবে। সময়ে সময়ে তাদের স্বাধীনতার সংজ্ঞা বদলাবে, সময়ের সাথে সাথে নিজেদেরকে প্রাসঙ্গিক করে রাখার জন্য তারা অনেক কিছুই করবে। দিনশেষে নির্ধারিত হবে না নারীর অধিকার, মুক্তির পথ। সাধারণ নারীবাদীরা আশা করে থাকে সেক্যুলারিজম সবাইকে সুযোগ দেবে এবং এর হাত ধরেই আসবে সমতা ও স্বাধীনতা। এ পন্থায় নারীর ভবিষ্যতে ধ্বংস ছাড়া আর কিছু নেই।

নারীবাদী নারীদেরকে নিজেদের সত্যিকার মূল্য বুঝতে হবে। তাদের মুক্তির প্রথম ধাপ হলো নারীবাদী আন্দোলন থেকে নিজেদেরকে বের করে নেওয়া। তাদের বোঝা উচিত, নারীবাদ যাকে মুক্তি বলে তা আসলে দাসত্ব, বন্দিত্ব। নারীবাদ যাকে বন্দিত্ব বলে দেখিয়েছে, শিখিয়েছে তাতেই আসলে মুক্তি। পপ কালচার বা প্রশাসনের শিখিয়ে দেওয়া বুলি মুক্তি না, মুক্তি আছে দাসত্বে, পরম করুণাময়ের দাসত্বে।

বিষয়টি বুঝতে হলে আধুনিক নারীদেরকে তাদের আগের সব মানসিক বেড়াজাল, জাতিগত ঘৃণা, বস্তুবাদী শিক্ষার সব ভূত থেকে বের হয়ে এসে ইসলামকে জানতে হবে। জানতে হবে জানার ও বোঝার মানসিকতা নিয়ে।

নারীরা পরম করুণাময় আল্লাহর অন্যতম সুন্দর এক সৃষ্টি। তারা কেবল আল্লাহর দাসত্ব করতে, তাঁর কাছে আত্মসমর্পণ করতেই জন্মেছে; পুরুষের কাছে নয়। যদি এ সহজ সত্য তারা মেনে নেয়, আল্লাহ ও দ্বীনকে ভালোভাবে জানে, তাহলে তারা বুঝবে কোথায় লুকিয়ে আছে তাদের শক্তি, পৃথিবীর উন্নয়ন আসলেই কীসে নিহিত এবং তারা কীভাবে ঘৃণার চর্চা না করে শান্তি ফিরে পাবে।

প্রকৃত স্বাধীনতা সীমাহীন স্বাধীনতা নয়; বরং এমন জীবনব্যবস্থা যেখানে মানুষ আল্লাহর নির্দেশনার আলোকে নিজের মর্যাদা, নিরাপত্তা ও কল্যাণ নিশ্চিত করতে পারে। সব স্বাধীনতাই মুক্তি এনে দেয় না; কিছু স্বাধীনতা এমনও হতে পারে, যা মানুষকে অদৃশ্যভাবে শোষণ ও সংকটের দিকে ঠেলে দেয়। সেখান থেকেই প্রশ্ন উঠে—যে স্বাধীনতাকে মুক্তির পথ বলা হচ্ছে, তা কি সত্যিই মুক্তি, নাকি নতুন রূপে এক সূক্ষ্ম ফাঁদ?

রানী চাকরানী

চাকরানী!

আমি বাড়ির চাকরানি নই!

নারী কি স্বামী ও সন্তানের জন্য শুধু চাকরানির মতো ঘরের কাজ করে যাবে? পুরুষ কি আমাদেরকে ‘প্রজন্মের প্রতিপালনকারী’ বলে উপহাস করতে চায়? এ কথার আড়ালে কি আমাদের চাকরানি বানাতে চায়?

নিজে জ্বলে অন্যকে আলো বিলানোই কি নারীর কাজ? নারী কি এভাবে জ্বলে জ্বলে তার স্বামী-সন্তানকে আলো বিলিয়ে যাবে? তারা কি চায় আমরা একজন রাঁধুনি, ধোপানি আর পরিচ্ছন্নতাকর্মী হিসেবে জীবনটা কাটিয়ে দিবো?

সে আমার স্বামী। তার মানে এই নয় যে, আমাকে শাসন করার অধিকার তার আছে। তার এ কথা জিজ্ঞেস করার অধিকার নেই যে, আমি কোথেকে ফিরলাম? কোথায় যাব? আমি একজন স্বয়ংসম্পূর্ণ মানুষ। তাহলে আমাকে ঘর থেকে বের হওয়ার সময় কেন তার থেকে অনুমতি নিতে হবে? আমি অনুমতি নেব? আমার কি কোনো কিছু কম আছে যে, আমি তার অনুগত হয়ে চলব? সে আমার স্বামী। তার মানে এই নয় যে, আমাকে সে কিনে ফেলেছে। আমি তো তার দাসী নই!

***

বস: আসতে দেরি হলো কেন?

নারী চাকরিজীবী: সরি বস! আমার একটু ব্যক্তিগত ব্যস্ততা ছিল। তাই আসতে দেরি হয়ে গেল।

বস: এসব অজুহাত শুনতে চাই না। আর কোনো দিন যেন দেরি না হয়। তোমার অনুপস্থিতিতে অফিসের কাজ বিলম্বিত হচ্ছে।

নারী চাকরিজীবী: আর হবে না বস।

বস: আগামীকাল সকাল আটটায় যেকোনো মূল্যে তোমাকে অফিসে উপস্থিত থাকতে হবে।

নারী চাকরিজীবী: ঠিক আছে বস।

বসের কথাগুলো খুব ঝাঁজালো ছিল। তবে তার এমন আচরণের যৌক্তিকতা আছে। এ জন্য তাকে দোষ দেয়া যায় না। কাজের স্বার্থেই তাকে এমনটি করতে হয়। তাই তিনি যতই কঠোরতা করুন না কেন, আমাকে তা সহ্য করতে হবে। কারণ, এটা আমার কর্মক্ষেত্র। আমার সফলতা ও স্বাতন্ত্র্যের উৎস। আমি কারও উপর নির্ভরশীল হয়ে জীবন কাটাতে চাই না।

নারী স্বামীর কর্তৃত্ব মেনে নিচ্ছে না। তার বিষয়ে স্বামীর নাকগলানোকে পছন্দ করছে না। অথচ একই নারী অফিসে তার বসের কর্তৃত্ব মেনে নিচ্ছে এবং তার আদেশকে সম্মান করছে। বস যখন বলছে, কেন দেরি করে এলে? তখন সে তার প্রশ্নটিকে উদারচিত্তে গ্রহণ করছে। তার রুমের দরজায় অনুমতির জন্য দাঁড়িয়ে থাকছে। খুব সম্মান ও ভদ্রতার সাথে নরম ভাষায় তার সাথে কথা বলছে। অথচ এই নারীই স্বামীর কাছে অনুমতি নেয়ার ব্যাপারটিকে অপমানজনক মনে করছে। অদ্ভুতভাবে নারী তার অফিসের স্বার্থ বোঝে। বসের আচরণকে মেনে নেয়। চাকরির স্বার্থে সে সবকিছু মেনে নেয়। কিন্তু এই নারীর প্রতি যখন স্বামী রাগ করে, তখন সে তা মেনে নিতে পারে না। পরিবার বা সংসারের কোনো স্বার্থই তার বুঝে আসে না। সে তখন বিচ্ছেদ চেয়ে বসে। তারপর সেই সিদ্ধান্তের সাথেই নিজেকে মানিয়ে নেয় এবং নিজেকে স্বাধীন মনে করে জীবন যাপন করতে শুরু করে।

নারী একজন পুরুষ তথা স্বামী বা পিতার কর্তৃত্ব মানছে না। অথচ অফিসে গিয়ে একাধিক অপরিচিত পুরুষের কর্তৃত্ব মাথা পেতে নিচ্ছে। কখনো কখনো তার উপর কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠাকারী এসব পুরুষের মাঝে পরিবর্তন ঘটছে। একজন যাচ্ছে, আরেকজন

আসছে। তবু সে তাদের কর্তৃত্ব অকপটে মেনে নিচ্ছে। অথচ তাদের কেউই তার জন্য নিরাপদ নয়। কারণ, তাদের চরিত্র ও শিষ্টাচার সম্পর্কে নারী ওয়াকিফহাল নয়। মোটকথা, সে উত্তম জিনিসের পরিবর্তে নিকৃষ্ট বস্তু গ্রহণ করছে!

যেন কুরআনের এই আয়াতই তার ক্ষেত্রে বাস্তবায়িত হচ্ছে:

أَتَسْتَبْدِلُونَ الَّذِي هُوَ أَدْنَى بِالَّذِي هُوَ خَيْرٌ ۚ

'তোমরা কি নিকৃষ্ট জিনিসকে তার পরিবর্তে গ্রহণ করতে চাও, যা উত্তম?'[6]

আধুনিকতা আর স্বাধীনতার নামে নারীকে পারিবারিক দায়িত্ব ও স্বামীর নেতৃত্ব থেকে বের নিয়ে যাচ্ছে। যেখানে ইসলাম নারীদের 'রাব্বাতুল বাইত' অর্থাৎ, ঘরের রানী হিসেবে সম্মান দিয়েছেন সেখানে স্বাধীনতার নামে পশ্চিমারা শেখাচ্ছে স্বামীর আনুগত্য মানে পরাধীনতা, ঘর হচ্ছে নারীর কারাগার, মাতৃত্ব (যা তার নারীত্বের সম্মান) আর সন্তান মানে হচ্ছে বোঝা।

চাকরি ও কর্মক্ষেত্রের কঠোর শৃঙ্খলাকে স্বাধীনতার নাম দেওয়া হয়। যেটাই প্রকৃতপক্ষে পরাধীনতা। সে আপনজনের স্নেহমিশ্রিত দায়িত্বশীলতাকে প্রত্যাখ্যান করে, অপরিচিত মানুষের নির্দেশনাকে স্বাভাবিকভাবে গ্রহণ করে।

অথচ ইসলাম নারীকে অপমানিত বা অবমূল্যায়িত করেনি; বরং তাকে সর্বোচ্চ মর্যাদা, নিরাপত্তা এবং সম্মানের অবস্থানে অধিষ্ঠিত করেছে।

তাই একজন মুসলিম নারী হিসেবে পশ্চিমাদের স্বাধীনতার বাহ্যিক স্লোগানে বিভ্রান্ত না হয়ে আল্লাহপ্রদত্ত জীবনব্যবস্থাকে উপলব্ধি করা এবং বুঝতে চেষ্টা করা যে, প্রকৃত সম্মান মানুষের দাসত্বে নয়, বরং একমাত্র আল্লাহর বিধানের অনুসরণেই নিহিত।

এবং আমাদের এটাও চিন্তা করা উচিৎ রানীর মর্যাদা আসলে কিসে কে রানী কে চাকরানী!

রানী চাকরানী

***

৬. সূরা বাকারাহ্, ২:৬১

শেয়াল মুরগির স্বাধীনতা চায়

পৃথিবীর সব শেয়াল মুরগির স্বাধীনতা চায়!

প্রশ্ন হচ্ছে, কেনো চায়?

সব ধরনের স্বাধীনতার আহ্বান সবসময় কল্যাণকর উদ্দেশ্য থেকে আসে না; কখনো কখনো এর পেছনে ভিন্ন স্বার্থও কাজ করতে পারে। আধুনিক বিশ্বে নারী স্বাধীনতা ও ক্ষমতায়নের নামে যা কিছু ধারণা প্রচার করা হয়, বাহ্যিকভাবে তা আকর্ষণীয়ও মনে হয়।

পশ্চিমা গণমাধ্যম, বিনোদন শিল্প, বিজ্ঞাপন জগৎ এবং ভোগবাদী অর্থনৈতিক ব্যবস্থা নারীর স্বাধীনতার ভাষা ব্যবহার করলেও বাস্তবে নারীকেই ভোগ্যপণ্য হিসেবে উপস্থাপন করে। বিজ্ঞাপন, চলচ্চিত্র, ফ্যাশন শিল্প, বিনোদন জগৎ এবং সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে নারীর সৌন্দর্য ও দেহকে কেন্দ্র করে যে বাণিজ্য পরিচালিত হয়, তা প্রমাণ করে যে আধুনিক ভোগবাদী সমাজ নারীকে সম্মানিত মানুষ হিসেবে নয়, বরং ভোগ্যপণ্য হিসেবে উপস্থাপন করে। মিডিয়ায় নারীকে যৌন আবেদনময়ী পণ্য হিসেবে উপস্থাপন করে পশ্চিমা বাজারব্যবস্থা নারীর দেহকে মুনাফার হাতিয়ার বানিয়েছে। একদিকে নারীকে বলা হয় সে সম্পূর্ণ স্বাধীন, অন্যদিকে তার সৌন্দর্য, পোশাক, শারীরিক আকর্ষণ এবং সামাজিক গ্রহণযোগ্যতাকে কেন্দ্র করে বিশাল একটি বাজার গড়ে তোলা হয়।

পশ্চিমাদের গেলানো সমান অধিকার ও নারীবাদের বিষবাষ্প ধীরে ধীরে দূষিত করে তুলছে মুসলিম পারিবারিক জীবনকে। যার ফলে পশ্চিমাদের দেখানো আলোর পিছনে অন্ধকারে হারিয়ে যাচ্ছে নারী। অধিকার হারাচ্ছে পুরুষ, আর অনাদর ও অবহেলায় শৈশব কাটাচ্ছে শিশু।

পশ্চিমা নারী স্বাধীনতাে স্লোগানধারীরা আমাদের নারীদেরকে পশ্চিমা নারীর মতো স্বাধীন বানাতে চাচ্ছে। পশ্চিমা নারীর মতো বন্ধনহীন বানাতে চাচ্ছে। বানাতে চাচ্ছে তাদের মতোই গৃহহীন। অথচ এই স্বাধীনতার আড়ালে নারীর জন্য অপেক্ষা করছে এক বিভীষিকাময় জীবন। যে জীবনে নারীর কোনো বাবা নেই, ভাই নেই, স্বামী নেই, সন্তান নেই। যে জীবনে তার চারপাশে ঘুরঘুর করছে লোভাতুর কামনা সক্ত পুরুষ। তাকে খুবলে খাওয়ার জন্য ওত পেতে আছে ক্ষুদার্থ শেয়ালরা। কিন্তু সেই পথে তাকে রক্ষা করার জন্য নেই কোনো বাবা ও ভাই। তাকে আগলে রাখার জন্য নেই কোনো

স্বামী। এটা এমন জীবন, যে জীবনে একবার প্রবেশ করার পর হাজারবার তা থেকে পরিত্রাণ চাচ্ছে পশ্চিমা বিশ্বের নারীরা।

আমাদের বোনদের বোকা বানানো হচ্ছে। একদল পুঁজিবাদী নিজেদের স্বার্থে আমাদের বোনদের বানাচ্ছে ভোগের বস্তু, বাবা স্বামীর হাত থেকে বের করে এনে নিজেরা শাসন করছে, ইসলাম ও পরিবারের ছায়া থেকে তাদের বের করে হায়নার মতো চিবি চিবিয়ে শেষ করে দিচ্ছে।

হে বোন আমার, ওরা তোমাকে স্বাধীনতার প্রলোভন দেখায়। মুক্তির কথা বলে। স্বাবলম্বিতার স্বপ্ন দেখায়। ওরা বলতে চায়, তুমি পরাধীন। তোমার ঘর তোমার কারাগার। তোমার স্বামী তোমার মনিব। তোমার সন্তান তোমার বোঝা। ওরা চায় তুমি ঘর থেকে বেরিয়ে যাও। পরিবারের মায়ার বাঁধন ছিঁড়ে ফেলো। কর্মাঙ্গণে গিয়ে পুরুষের পাশে দাঁড়াও। মাস শেষে কয়েকটি মুদ্রার মালিক হয়ে নিজেকে সফল ভাবতে থাকো। আসলেই কী তুমি পরাধীন? তাহলে ওরা কেন তোমাকে স্বাধীন করতে চায়?

ওরা চায় তুমি তোমার স্নেহশীল পিতা ও দায়িত্ববান স্বামী থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাও। তাদের নিরাপত্তা ও দায়িত্বের ছায়া থেকে বেরিয়ে যাও। তারপর কর্পোরেট জগতের আলো আঁধারীতে ওরা তোমাকে খুবলে খুবলে খাবে। সামান্য কিছু মুদ্রার বিনিময়ে ওরা কিনে নিতে চাইবে তোমার স্বাধীনতা, ব্যক্তিত্ব, পবিত্রতা, চরিত্র, দেহ সবকিছু। নারী স্বাধীনতার চটকদার সব শ্লোগানের আঁড়ালে ওরা লুকিয়ে রাখে ওদের দূরভিসন্ধি।

ওরা তোমাকে স্বাধীনতার বুলি শুনিয়ে ওরা আসলে কী হাসিল করতে চায়? কোথায় নিয়ে ওরা তোমাকে দাঁড় করাতে চায়? তোমার প্রকৃত স্বাধীনতা আসলে কোথায়? তোমার রব তোমাকে কী বিধান দিয়েছেন? তিনিই কি তোমার জন্য যথেষ্ট নন?

নারী ও পুরুষ: সমতা নাকি পরিপূরকতা?

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাআ'লা মানুষ কে একটি নির্দিষ্ট পন্থায় সৃষ্টি করেছেন। একেকজনকে সৃষ্টি করেছেন ভিন্ন ভিন্ন যোগ্যতা ও সম্মান দিয়ে। আল্লাহ মানুষকে দুই লিঙ্গে সৃষ্টি করারও যেমন কারণ আছে তেমনি জেন্ডার রোল ঠিক করে দেওয়ারও কারণ আছে। যার কারণে আমরা দেখতে পাই পৃথিবীর ইতিহাসে ৯০% এর বেশি সভ্যতা নারী পুরুষের আলাদা জেন্ডার রোল মেনেই পরিচালিত হয়েছে। ৯০% এর

বেশি সমাজ ছিলো পুরুষতান্ত্রিক। স্বাভাবিক ভাবেই একগাদা ডিগ্রি নিয়ে শেষ জীবনে স্বামী-সন্তান ছাড়া একা একা মৃত্যুবরণ করা নারীর চেয়ে, ডিগ্রিহীন অবস্থায় ঘরভর্তি সন্তান ও নাতিদের নিয়ে মৃত্যুবরণ করা নারী বেশি সুখী।

এবার আসি মূল বিষয়ে, সমসাময়িক নারীবাদী চিন্তাধারার একটি কমন দাবি হলো নারী ও পুরুষের পূর্ণ সমতা। অর্থাৎ, নারীবাদের মতো আন্দোলনগুলো 'লিঙ্গ-সমতা'-কে সমর্থন করে, সে সমতায় পুরুষকে মানদণ্ড হিসেবে বিবেচনা করা হয়। নারী যত বেশি পুরুষের মতো হতে পারবে ততই যেন সফল হতে পারবে। তারা নারী-পুরুষ উভয়কে লেভেল প্লেয়িং ফিল্ডে নিয়ে আসতে চায়। তবে ইসলামী দৃষ্টিকোণ থেকে নারী ও পুরুষকে অভিন্ন সত্তা হিসেবে নয়, বরং পরস্পরের পরিপূরক হিসেবে বিবেচনা করা হয়। ইসলাম নারী ও পুরুষ উভয়কেই মানবিক মর্যাদা, সম্মান ও দায়িত্বের ক্ষেত্রে মূল্যবান মনে করে; তবে তাদের সৃষ্টিগত বৈশিষ্ট্য, শারীরিক গঠন এবং সামাজিক দায়িত্বের ক্ষেত্রে কিছু পার্থক্য স্বীকার করে। এই পার্থক্যকে ইসলাম বৈষম্য হিসেবে নয়, বরং মানবসমাজে ভারসাম্য ও পারস্পরিক সহযোগিতার ভিত্তি হিসেবে দেখে।

বৈজ্ঞানিকভাবে নারী ও পুরুষের মধ্যে কিছু স্বাভাবিক পার্থক্য বিদ্যমান। সাধারণভাবে পুরুষদের শারীরিক শক্তি, পেশীর পরিমাণ এবং অস্থির ঘনত্ব নারীদের তুলনায় বেশি হয়ে থাকে, অন্যদিকে নারীরা মাতৃত্ব, সন্তান ধারণ ও লালন-পালনের বিশেষ সক্ষমতা লাভ করে। আধুনিক বিজ্ঞানও নারী ও পুরুষের মধ্যে বিভিন্ন শারীরিক ও হরমোনগত পার্থক্যের কথা স্বীকার করে। এসব পার্থক্য তাদের মূল্যমান নির্ধারণ করে না; বরং তাদের স্বতন্ত্র ভূমিকা ও দায়িত্ব পালনে সহায়তা করে।

কিন্তু মজার ব্যাপার হচ্ছে, নারীবাদীরা পুরুষের মতো সুবিধা, অধিকার পাওয়াকে নিজেদের সফলতার মানদণ্ড হিসেবে দেখলেও, কিন্তু তারা দায়িত্বে সমান অংশীদার হতে রাজি নয়।

যদি ধরেও নিই, প্রচলিত সমাজে নারীরা অপমানিত, পুরুষরা সম্মানিত, আলোকিত; তাহলে তো নারীর পুরুষের সমান সম্মান অর্জন করার জন্য পুরুষের মতোই কাজ করা উচিত। নারীরা যখন সর্বাত্মকভাবে কেবল পুরুষের সমান অধিকারই ভোগ করতে চায় এবং সকলপ্রকার দায়িত্ব এড়িয়ে যায়, দেখা যায় তারা সেই একই জুলুম পুরুষের ওপর চাপিয়ে দিচ্ছে যার জন্য তারা পুরুষকে দোষারোপ করত। বিষয়টি পুরোই নিজের স্বার্থে ক্ষমতা প্রয়োগ।

ইসলামে অবশ্যই একজন নারীর অধিকারের কথা রয়েছে। পাশাপাশি নারীকে কিছু দায়িত্ব পালনের নির্দেশও দেওয়া হয়েছে। তাঁর দায়িত্ব হলো তাঁর স্বামীর হক ও সম্পদ রক্ষা করা এবং সন্তানদের সঠিকভাবে লালনপালন করা, দ্বীনের ওপর বড় করে তোলা। অন্যদিকে স্বামী হবেন পরিবারের প্রধান। তিনি তাঁর স্ত্রী এবং সন্তানদের কাজ, আচরণ ও মৌলিক চাহিদার জন্য আল্লাহর কাছে দায়বদ্ধ।

পশ্চিমা-সমাজে নারী-পুরুষের কোনো সুনির্দিষ্ট আদর্শিক অবস্থান, নৈতিকতা কিংবা মূল্যবোধ নেই। তারা জানে না তারা কেন বাঁচে, কী করা উচিত। কাজেই, সেখানে নারী-পুরুষদের মধ্যে হতাশা এবং নৈরাজ্য সৃষ্টি হওয়া খুব স্বাভাবিক। নারীরা পুরুষের 'সমান' হবার চেষ্টায় কয়েক শতাব্দী ব্যয় করে ফেলেছে, অথচ তারা একবারও জিজ্ঞেস করার সময় পায়নি, যেসকল কারণে তারা পুরুষদের সেরা মনে করছে সেগুলো আসলেই তাদের সফলতা বা শ্রেষ্ঠত্বের মানদণ্ড কিনা।

ইসলামের দৃষ্টিতে নারী ও পুরুষ একে অপরের প্রতিদ্বন্দ্বী নয়; বরং সহযোগী এবং একে অপরের পরিপূরক। আল্লাহ তাআলা স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক সম্পর্কে বলেন, "তারা তোমাদের জন্য পোশাকস্বরূপ এবং তোমরা তাদের জন্য পোশাকস্বরূপ"[7] এ আয়াত নারী ও পুরুষের পারস্পরিক নির্ভরতা, সহযোগিতা এবং পরিপূরকতার ধারণাকে স্পষ্ট করে। একইভাবে আল্লাহ তা'আলা আরও বলেন,

وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثَىٰ

অর্থাৎ, "পুরুষ নারীর মতো নয়"[8]

এ আয়াত নারী ও পুরুষের সৃষ্টিগত অভিন্নতা নয়, বরং স্বাতন্ত্র্যের প্রতি ইঙ্গিত করে। নারী ও পুরুষের মধ্যে শারীরিক পার্থক্যের পাশাপাশি কিছু মানসিক ও স্বভাবগত বৈশিষ্ট্যেও ভিন্নতা লক্ষ্য করা যায়। সাধারণভাবে পুরুষদের মধ্যে নেতৃত্ব, ঝুঁকি গ্রহণ ও বাহ্যিক দায়িত্ব পালনের প্রবণতা বেশি দেখা যায়, অন্যদিকে নারীদের মধ্যে মমতা, কোমলতা, ধৈর্য এবং লালন-পালনের বৈশিষ্ট্য অধিক পরিলক্ষিত হয়। তবে এসব বৈশিষ্ট্য ব্যক্তি ভেদে কম-বেশি হতে পারে। ইসলামী দৃষ্টিকোণ থেকে এই ভিন্নতা কোনো পক্ষের শ্রেষ্ঠত্ব বা হীনতার প্রমাণ নয়; বরং মানবসমাজে পারস্পরিক সহযোগিতা ও ভারসাম্য প্রতিষ্ঠার জন্য আল্লাহপ্রদত্ত স্বাভাবিক ব্যবস্থা।

---

[7] সূরা আল-বাকারা, ২: ১৮৭

৪. সূরা আল-ইমরান, ৩:৩৬

অতএব ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গিতে নারী ও পুরুষের সম্পর্ক প্রতিযোগিতা বা আধিপত্যের নয়; বরং পারস্পরিক সহযোগিতা, দায়িত্ববোধ এবং ভারসাম্যের।
তাদের প্রত্যেকের নিজস্ব বৈশিষ্ট্য ও দায়িত্ব রয়েছে, একজনের শক্তি অন্যজনের ঘাটতি পূরণ করে এবং এভাবেই পারস্পরিক সহযোগিতার মাধ্যমে একটি সুস্থ ও স্থিতিশীল সমাজ গড়ে ওঠে। ইসলাম এই ভিন্নতাকে সংঘাতের কারণ হিসেবে নয়, বরং মানবজীবনের স্বাভাবিক ও কল্যাণকর বাস্তবতা হিসেবে বিবেচনা করে। মুসলমান হিসেবে আমরা বিশ্বাস করি, আল্লাহ তাআলাই আমাদের সৃষ্টিকর্তা, পালনকর্তা ও সর্বজ্ঞ বিধানদাতা। অতএব আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাআ'লার নির্ধারিত বিধান ও প্রজ্ঞার মধ্যেই মানবজাতির প্রকৃত কল্যাণ, সফলতা এবং শান্তি নিহিত রয়েছে।

সমান অধিকার কথাটাই হাস্যকর!

এক. বিপ্লব সরকারের পাঁচ পুত্র। বড়জনের বয়স বিশ আর সবচে' ছোটজনের বয়স তিন। সমান অধিকারের দাবি মানতে গেলে হয়তো ছোট শিশুকে খাসা তিন চারটা রুটি খেতে হবে অথবা সবচে' বড় ছেলে লেবুকে শুকিয়ে মরতে হবে শিপুর ফিডার খেয়ে। ঈদের জন্যে শিপুর বাজেট যদি এক হাজার টাকা হয়-লেবুকে তো ওই টাকায় এক জোড়া জুতা কিনেই বসে থাকতে হবে। অথচ শিপু জুতা মোজাসহ পুরো শরীর সাজিয়ে বসে থাকবে এক হাজার টাকায়। কলেজ পড়ুয়া লেবুর প্রতি কি সেটা সুবিচার হবে? অবশ্য সমানাধিকার হবে।
সন্তানদের একজনের রুচি ডাক্তার হবে। আরেকজন হবে ইঞ্জিনিয়ার। সোজা কথা, দুইজনের খরচ সমান নয়। সমান অধিকার বলছে-ওসব বুঝি না। ঢাকা ইউনিভার্সিটিতে রাষ্ট্রবিজ্ঞানে তোমার যে ভাই পড়ছে বুয়েটে পড়লেও তুমি সেই খরচই পাবে। জানি না, এটা কোনো বিচারের কথা!
একজন বাড়িতে থেকে পড়াশোনা করবে। অন্যজন মেধায় ভালো হওয়ায় পড়বে শহরে। পিতা কি এই দুই পুত্রকে সমান খরচ দিবেন? পিতা তার কাজে একজনকে পাঠিয়েছেন নিকটস্থ বাজারে। দুপুরে তাকে সেখানে খেতে হবে। আরেকজনকে পাঠিয়েছেন শহরে। দুপুরে তাকেও খেতে হবে। দুই জায়গায় খাওয়ার খরচ কি সমান? শহরে তো পানিটাও কিনে খেতে হয়। বাবা কি তার দুই পুত্রকে সমান খরচ দেবেন?

ইনসাফ ও সমানাধিকারের সংঘাত এখানে। ইসলাম ইনসাফের ধর্ম। সমানাধিকারের মতো কৌতুক-ধর্ম হলে ইসলাম দেড় হাজার বছরের পথ পাড়ি দিয়ে দুই হাজার এগারো সালের বিজ্ঞানপ্লাবিত ইউরোপে শত শত গির্জাকে আযানের বাণী শোনাতে পারতো না। ইসলাম ন্যায় ও সততার ধর্ম। ইনসাফ ইসলামের অন্যতম বৈশিষ্ট্য।

দুই. বাবা তারেক মারা গিয়েছেন। তার সাবালক পুত্র কাসেমকে তার প্রাপ্য সম্পদ বুঝিয়ে দিবে ইসলাম। কিন্তু নাবালক শিশু হামেদমকে তার সম্পদ বুঝিয়ে দিবে না। কারণ কেউ তাকে চকলেট খাইয়ে তার বিশাল সম্পদ হাতিয়ে নিতে পারে। ফলে তার সম্পদ থাকবে তার অভিভাবকের হাতে যতদিন না সে সাবালক হচ্ছে। এটা সমানাধিকার নয়। ইনসাফ। সমান অধিকারের কথা হলে তো শিশু হামেদকে এক হাতে ফিডার আরেক হাতে সম্পদের দলিল তুলে দিতে হতো। সে দলিল হতো হয় তো তার মৃত্যুর পরোয়ানা।

মোট কথা, কাসেম হামেদ দু'জনই পুত্র। দুইজনের সঙ্গে দুই রকমের আচরণ করা হয়েছে। এটাকে কি কেউ অবিচার জুলুম কিংবা ঠকানো বলবে? যে সুস্থ মানুষ সে অবশ্যই বলবে এটা ইনসাফ। কারণ, দুইজনের অবস্থা এক নয়। নারী ও পুরুষের অবস্থাও ভিন্ন। সেই অবস্থার প্রেক্ষিতেই সৃষ্টিকর্তা সম্পদ বণ্টন করেছেন। কোনো সুস্থ মানুষ এ নিয়ে প্রশ্ন তুলতে পারে না।

আজ যারা সমানাধিকারের কথা বলছে তারা কৌশলে নারীকে টেনে নিয়ে যাচ্ছে বেইনসাফির অন্ধ গলিতে। মজার বিষয় হলো, যারা নারীকে স্বাধীনতা ও সমান অধিকারের বাতি দেখিয়ে পেছনের গলিতে টেনে নিয়ে যাচ্ছে-তারা যৌনতার কথাটাও গোপন রাখছে না। নারী তার 'অবলা' নামটা রাখবে বলে হাত ধরে টান দিতেই নেমে যাচ্ছে সেই অন্ধকার গলিটায়। স্বাধীনভাবে বিলিয়ে দিচ্ছে তার পূর্বপুরুষের ভাষায়- 'নারীর শ্রেষ্ঠ সম্পদ'!

এই নিয়েই তার অহঙ্কার এখন আমরা স্বাধীন! কে বলেছে আমরা পারি না!

মূলত অবলা নারী আর দুর্বল শিশুদের নিয়ে যেন কেউ অমানবিক ও পশুখেলা খেলতে না পারে সে জন্যে ইসলাম তার অনুসারীদের দান করেছে পরিবার নামক এক দুর্জয় কেল্লা। যেখানে দায়িত্ববান রোজগারী পুরুষ, ঘরের রানী স্ত্রী, স্নেহস্নাত ছেলেমেয়ে আর বয়সক্লান্ত মা-বাবা নিয়ে কর্তব্য ও ভালোবাসায় উদ্ভাসিত এক মানবরূপ। এই রূপের কাছে ম্লান পৃথিবীর সকল কালের সকল নরকসভ্যতা।

সেক্যুলার বনাম ইসলামে নারীর সম্মান

নারী নির্যাতনের ইতিহাস প্রমাণ করে, আল্লাহর আইন ছাড়া আর সকল আইনেই নারীরা নির্যাতিত, অপদস্থ হয়েছে। এ বাস্তবতাকে অস্বীকার করে নিজেদের অধিকার আদায়ের জন্য, নিজেদেরকে প্রাসঙ্গিক করে রাখার জন্য নারীদেরকে তিনটি ঐতিহাসিক অবস্থা বা 'ওয়েভ'-এর মধ্য দিয়ে যেতে হয়েছে। কিন্তু কোনো লাভ হয়নি। উল্টো মাথা গজিয়েছে নতুন নতুন সমস্যার। সেক্যুলার গুরুরা এখন ভিন্ন ক্রিটিক্যাল কিংবা ডানপন্থী, এমনকি অনেক সময় ইসলামি ব্যাখ্যা দিয়ে হলেও নিজের অবস্থান ধরে রাখার চেষ্টা করে।

নারীবাদের সমস্যা আসলে অর্থনৈতিক। নারীবাদের তত্ত্ব কেবল শ্রমজীবি অধিকারকেই (আসলে ব্যাংকিং সেক্টরকে) লাভবান করেছে তা নয়; বরং এ নিহিলিস্টিক সিস্টেমে তারা নারীদের ওপর হওয়া সত্যিকার জুলুম নিয়ে কথা বলতে মোটেই আগ্রহী না। তাদের কোনো ঐশী কর্তৃপক্ষ নেই যে তাদেরকে শিখিয়ে দেবে কীসের দাম কেমন। তারা বস্তুবাদী জীবন আর অর্থনীতিকেই বানিয়ে নিয়েছে তাদের খোদা। তাই তা দিয়েই সব বিচার হয়। অর্থই সব।

এবার সেক্যুলার সিস্টেমে এবং ইসলামি সিস্টেমে নারীর সম্মানের তুলনা করার চেষ্টা করবো ইন শা আল্লাহ।

ইসলামে মানবজীবন পুরোটাই **(হুরমাহ/হুরমাত) حرمة** শব্দের সাথে যুক্ত। যার অর্থ সম্মান, মর্যাদা/ পবিত্রতা। আল্লাহর কাছে মানুষের রক্ত, জীবন, সম্পদ, সম্মানের মর্যাদা পৃথিবীর যেকোনো বস্তুবাদী বিষয়ের চেয়ে বেশি। কেবল তাই না, রাসুলুল্লাহ ﷺ মতে, মুসলিমের রক্তের মূল্য কাবার চেয়েও বেশি। নারীর সম্মানের মর্যাদা এখানে পরিবর্তন হবে না।[9] এ সম্মান অন্তর্নিহিত এবং অতিক্রান্ত, এ সম্মান আল্লাহর দেওয়া।

ইসলাম ছাড়া আর কোনো আদর্শ এমন সম্মান দেয়নি। সেক্যুলার সমাজ তো আরও না। এখানে মানুষ হলো অর্থনীতির চাকা। ইসলাম সবাইকে নারীর সম্মান বোঝার দিকে আহ্বান করে। এ সম্মান আল্লাহর কাছ থেকে আসা, কোনো মানুষের ঠিক করে দেওয়া না। একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের উদ্দেশ্যে নিজের প্রতিভা ও দক্ষতাকে

9. রাসুলুল্লাহ ﷺ বলেন, 'একজন মুমিনকে অকারণে হত্যা করা আল্লাহর চোখে পুরো পৃথিবী ধ্বংসের চেয়েও মারাত্মক'। (বায়হাকি) আব্দুল্লাহ ইবনে উমর বর্ণনা করেছেন, আমি রাসুলুল্লাহ ﷺ কে তাওয়াফ করতে করতে বলতে শুনেছি, 'তুমি কত পবিত্র! কত পবিত্র তোমার গন্ধ! তুমি কত মহান এবং কত মহান তোমার পবিত্রতা! সে আল্লাহর কসম যার হাতে মুহাম্মাদের জীবন, আল্লাহর কাছে একজন মুমিনের পবিত্রতা তোমার চেয়ে বেশি। তাঁর সম্পদ, তাঁর জীবন, তাঁর সবকিছুই পবিত্র এবং ভালো'। (সুনান ইবনে মাজাহ, হাদিস নং: ৩৯৩২)

কাজে লাগিয়ে মুসলিম নারীরা আত্মিক প্রশান্তি অনুভব করেন। কেননা সে তার সৃষ্টিকর্তার আনুগত্য করে। আল্লাহ যেভাবে জীবনযাপন করতে বলেছেন সেভাবেই জীবনযাপন করে। আর আল্লাহকে আনুগত্যের মাধ্যমে একজন মুসলিম নারী স্বাভাবিকভাবে মানবতারও সেবা করে।

সেক্যুলারিজমে নারীর গর্ভ কে হয় হেয় করা হয় কিংবা বস্তুগত উদ্দেশ্যে কাজে লাগানো হয়। কিন্তু ইসলামে গর্ভের অবস্থান সম্পূর্ণ ভিন্ন।

গর্ভ এর আরবি শব্দ হলো: رَحِم (রাহিম / রহিম)

যার অর্থ; গর্ভ /মাতৃগর্ভ/ জরায়ু

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাআ'লা কুরআনে বলেন;

يَخْلُقُكُمْ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ

অর্থ: "তিনি তোমাদের মাতৃগর্ভে সৃষ্টি করেন..." [10]

رَحِم শব্দটির মূল ধাতু ر-ح-م (র-হা-ম), যেখান থেকে رَحْمَة (রহমত, দয়া) শব্দটিও এসেছে। এজন্য ইসলামী সাহিত্যে মাতৃগর্ভ ও আত্মীয়তার সম্পর্ককে দয়া ও মমতার সাথে বিশেষভাবে যুক্ত করা হয়। আবার আল্লাহর দুটি নাম বা গুণের মূল শব্দ: আর-রাহিম এবং আর-রহমান (অতি দয়ালু এবং পরম করুণাময়)।

ইসলামে একজন গর্ভবতী নারীর সাথে অত্যন্ত কোমল এবং সহানুভূতিপূর্ণ আচরণ করা হয়। কিছু আফ্রিকান মুসলিম সম্প্রদায় সন্তান জন্মদানকে অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করে। তাদের মধ্যে মা এবং সন্তানের জন্য বিশেষ নির্জনতার ব্যবস্থা করার প্রথা চালু রয়েছে। রাসুলুল্লাহ ﷺ বলেছেন,

'মহান আল্লাহ বলেন, আমার নাম রহমান-দয়াময়। আমি রেহেম (জরায়ু, আত্মীয় সম্পর্ক) কে সৃষ্টি করেছি এবং আমার নাম থেকে তার নাম নির্গত করেছি। সুতরাং যে তাকে (গর্ভ ও আত্মীয়তার সম্পর্ক) বহাল রাখবে আমিও তার সাথে (রহমতের) সম্পর্ক বহাল রাখব। আর যে তা ছিন্ন করবে আমিও তাকে আমার থেকে ছিন্ন করব।'[11]

ইসলামে গর্ভের এমন সুউচ্চ মর্যাদার কারণে নারীর জীবন পরিবারের ধারক হিসেবে মূল্যায়িত হয়। ইসলাম নারীকে বস্তুবাদ এবং এর অন্তহীন, শ্বাসরুদ্ধকর প্রত্যাশা থেকে মুক্ত করে। বরং মাতৃত্বকে ইসলামেই প্রথম প্রকৃত সম্মান দিয়েছে এবং মর্যাদার সর্বোচ্চ শিখরে অধিষ্ঠিত করেছে। ইসলামে মাতৃত্বকে করা হয়েছে আধ্যাত্মিক তাৎপর্যপূর্ণ। যখন

---

[10]. সূরা আয-যুমার, ৩৯:৬

[11]. সুনানে তিরমিজি, ১৯০৭

এ গুরুত্ব এবং তাৎপর্য একজন মুসলিমা নারী অনুধাবন করতে সক্ষম হন, তখন তার পার্থিব অন্যান্য সমস্ত উদবেগ দূর হয়ে যায়। তারা তাদের দেহ , মনকে এসব প্রতিযোগিতামূলক মতাদর্শ এবং এদের মিথ্যা খোদাদের আক্রমণ থেকে রক্ষা করতে পারে। মুসলিম নারীরা অনুভব করে যে শুধু আল্লাহই তাদের সবচেয়ে ভালো জানেন এবং ভালোবাসেন।

নারীর গৃহে অবস্থান: কারাগার নয়, মর্যাদা ও নিরাপত্তার আশ্রয়

আল্লাহ তাআলা মানবজাতিকে নারী ও পুরুষ দুই ভাগে সৃষ্টি করেছেন। অতপর তাদের মাধ্যমে মানবজাতির বিস্তার ঘটিয়েছেন। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন,

هُوَ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا

“তিনিই তোমাদেরকে এক ব্যক্তি থেকে সৃষ্টি করেছেন ও তা থেকে তার স্ত্রী সৃষ্টি করেছেন। যাতে সে তার নিকট শান্তি পায়।”[12]

অন্যত্র ইরশাদ করেন,

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً

“হে লোকসকল! তোমরা তোমাদের প্রতিপালককে ভয় কর, যিনি তোমাদেরকে এক ব্যক্তি থেকে সৃষ্টি করেছেন এবং তাদের দু’জন থেকে ছড়িয়ে দিয়েছেন বহু নর ও নারী।”[13]

নিজ নিজ অবস্থা ও উপযোগিতা অনুসারে দুনিয়ার দায়িত্ব-কর্তব্য পালনে ও আল্লাহ তা’আলার ইবাদত-বন্দেগীর ক্ষেত্রে নারী-পুরুষে উভয়েই সমান অংশীদার। আর কিছু ব্যতিক্রম ছাড়া সাধারণ প্রায় সকল দ্বীনী বিষয়ে নারী-পুরুষ উভয়ই সমান। তাদের মাঝে কোনো পার্থক্য নেই। যেমন-তাওহীদ, আকীদা-বিশ্বাস, আল্লাহ তাআলার প্রতি সমর্পণ, কৃতকর্মের প্রতিদান-পুরস্কার কিংবা শাস্তি, ছওয়াব ও ফাযাইল ইত্যাদি। তেমনিভাবে শরীয়তের সাধারণ দায়িত্ব ও অধিকারের ক্ষেত্রেও নারী-পুরুষের মাঝে কোনো পার্থক্য নেই।

আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন,

---

[12]. সূরা আ’রাফ, ৭:১৮৯

[13]. সূরা আন নিসা, ৪:১

(তরজমা) “আমি সৃষ্টি করেছি জীন ও মানুষকে। এজন্য যে, তারা আমারই ইবাদত করবে।”[14]

“পুরুষ অথবা নারীর মধ্যে কেউ সৎ কাজ করলে ও মুমিন হলে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে এবং তার প্রতি অণু পরিমাণও জুলুম করা হবে না।”[15]

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً ۖ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُم بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

“মুমিন হয়ে পুরুষ ও নারীর মধ্যে যে কেউ সৎকর্ম করবে তাকে আমি নিশ্চয়ই পবিত্র জীবন দান করব এবং তাদেরকে তাদের কর্মের শ্রেষ্ঠ পুরস্কার দান করব।”[16]

وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ ۚ لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَ

“যা দ্বারা আল্লাহ তোমাদের কাউকে কারো উপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন তোমরা তা লালসা করো না। পুরুষ যা অর্জন করে তা তার প্রাপ্য অংশ এবং নারী যা অর্জন করে তা তারই প্রাপ্য অংশ।”[17]

তবে সৃষ্টির উদ্দেশ্য, দৈহিক ও মানসিক গঠন ইত্যাদি দিক থেকে আল্লাহ তাআলা নারী ও পুরুষের মাঝে কিছু পার্থক্য রেখেছেন। পুরুষকে সৃষ্টি করেছেন পূর্ণ শক্তি দিয়ে। নারীর সকল দায়িত্ব পালন, তার নিরাপত্তা বিধান, ভরণ-পোষণ ও বংশের সংরক্ষণ ও প্রতিপালন তার দায়িত্ব ও কর্তব্য। পুরুষের দায়িত্ব সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন,

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ

“পুরুষ নারীর অভিভাবক। কারণ আল্লাহ তাদের একের উপর অন্যকে শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন এবং এজন্য যে, পুরুষ তাদের ধন-সম্পদ ব্যয় করে। সুতরাং সাধ্বী স্ত্রীরা অনুগতা এবং লোকচক্ষুর অন্তরালে আল্লাহর হিফাজতে তারা হিফাজত করে।”[18]

“নারীদের তেমনি ন্যায়সঙ্গত অধিকার আছে যেমন আছে তাদের উপর পুরুষদের। কিন্তু নারীদের উপর পুরুষের মর্যাদা আছে। আল্লাহ মহাপরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।”[19]

---

[14]. সূরা যারিয়াত: ৫৬
[15]. সূরা আন নিসা, ৪:১২৪
[16]. সূরা নাহল, ১৬:৯৭
[17]. সূরা নিসা, ৪:৩২
[18]. সূরা আন নিসা, ৪:৩৪
[19]. সূরা বাকারাহ্, ২:২২৮

“বিত্তবান নিজ সামর্থ্য অনুযায়ী ব্যয় করবে এবং যার জীবনোপকরণ সীমিত সে আল্লাহ যা দান করেছেন তা থেকে ব্যয় করবে।”[20]
“জনকের কর্তব্য যথাবিধি তাদের ভরণ-পোষণ করা।”[21]

পুরুষের এই দায়িত্ব-কর্তব্য ও শ্রেষ্ঠত্ব হাদীস শরীফেও বর্ণিত হয়েছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট স্ত্রীর প্রতি পুরুষের দায়িত্ব সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বলেন, যখন তুমি খাবে তখন তাকেও খাওয়াবে, যখন তুমি বস্ত্র পরিধান করবে তখন তাকেও পরিধান করাবে ...।[22]
অন্য হাদীসে আছে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন,
স্ত্রীদের বিষয়ে তোমরা আল্লাহকে ভয় কর। কেননা তারা তোমাদের নিকট আবদ্ধ। আল্লাহ তাআলার আমানতে তোমরা তাদেরকে গ্রহণ করেছ, আল্লাহর কালিমা দ্বারা তোমরা তাদের লজ্জাস্থানকে বৈধ করেছ। আর তাদের জন্য তোমাদের উপর রয়েছে তাদের সঙ্গত ভরণ-পোষণ।[23]
উপরোক্ত আয়াত ও হাদীস দ্বারা বোঝা যায় যে, নারীর সকল গুরুভার পুরুষের কাধে। পুরুষের দায়িত্ব হল নিজের ও পরিবারের ভরণ-পোষণের ব্যবস্থা করা। আর এসবের যোগান দেওয়ার জন্য প্রয়োজন জীবিকা উপার্জনের। সুতরাং তাকে গ্রহণ করতে হবে চাকরি, ব্যবসা কিংবা অন্য কোনো পেশা। আর ঘরের কোণে বসে এ দায়িত্ব আঞ্জাম দেওয়া সম্ভব নয়। এর জন্য প্রয়োজন ঘরের বাইরে বের হওয়া। এমনকি প্রয়োজনে দূর দূরান্ত সফর করা। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন,
“নামায সমাপ্ত হলে তোমরা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়বে এবং আল্লাহর অনুগ্রহ সন্ধান করবে ও আল্লাহকে অধিক স্মরণ করবে যেন তোমরা সফলকাম হও।”[24]
“অন্য আয়াতে বলেন, তোমাদের মধ্যে কেউ আল্লাহর অনুগ্রহ সন্ধানে দেশভ্রমণ করবে।”[25]

[20]. সূরা তালাক, ৬৫:৭
[21]. সূরা বাকারাহ, ২:২৩৩
[22]. সুনানে নাসায়ী ৫/৩৭৩; সুনানে আবু দাউদ, হাদীস : ১৮৩০

[23] সহীহ মুসলিম, হাদীস : ১৪৭; জামে তিরমিযী, আবওয়াবুর রিযা' হাদীস : ১১৬৩
[24]. সূরা জুম'আ, ৬২:১০
[25]. সূরা মুয্যাম্মিল, ৭৩:২০

সুতরাং বহিরাঙ্গনই হল পুরুষের প্রধান কর্মক্ষেত্র। বাইরে অবস্থান হল তার সাধারণ অবস্থা। ঘরে বসে থাকা পুরুষের জন্য শোভনীয় নয়। পক্ষান্তরে নারীকে আল্লাহ বানিয়েছেন দুনিয়ার জান্নাত। তিনি স্বামীর জন্য প্রশান্তি, সন্তানের জন্য আশ্রয়। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন,

"আর তাঁর নিদর্শনাবলির মধ্যে রয়েছে যে, তিনি তোমাদের জন্য তোমাদের মধ্য থেকে সৃষ্টি করেছেন তোমাদের সংগিনীদেরকে যেন তোমরা তাদের নিকট শান্তি পাও এবং তোমাদের মধ্যে পারস্পরিক ভালবাসা ও দয়া সৃষ্টি করেছেন।"[26]

(তরজমা) "তিনিই তোমাদেরকে এক ব্যক্তি থেকে সৃষ্টি করেছেন ও তা থেকে তার স্ত্রী সৃষ্টি করেছেন। যাতে সে তার নিকট শান্তি পায়।"(সূরা আরাফ : ১৮৯)

"নারী, সন্তান, রাশিকৃত স্বর্ণরৌপ্য আর চিহ্নিত অশ্বরাজি, গবাদি পশু এবং ক্ষেত-খামারের প্রতি আসক্তি মানুষের নিকট সুশোভিত করা হয়েছে।"(সূরা আল-ইমরান, ৩ : ১৪)

হাদীস শরীফে বর্ণিত হয়েছে-দুনিয়া হচ্ছে ক্ষণিক উপভোগের বস্তু। আর এর সর্বোত্তম সম্পদ নেককার নারী। একমাত্র ইসলামই নারীকে বানিয়েছে সর্বোচ্চ সংরক্ষিত। পরপুরুষ তার দিকে মুখ তুলেও তাকাতে পারবে না। নারীদেরকে আল্লাহ আদেশ করেছেন তারা যেন নিজেদেরকে সংরক্ষিত রাখেন। কুরআন মজীদে আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন, তারা যেন নিজেদের আভরণ প্রকাশ না করে তাদের স্বামী, পিতা, শ্বশুর, পুত্র, স্বামীর পুত্র, ভ্রাতা, ভ্রাতুষ্পুত্র, ভগ্নিপুত্র, আপন নারীগণ, তাদের মালিকানাধীন দাসী, পুরুষদের মধ্যে যারা যৌন কামনা-রহিত পুরুষ এবং নারীদের গোপন অঙ্গ সম্বন্ধে অজ্ঞ বালক ব্যতীত অন্য কারো নিকট।

আল্লাহ তায়ালা বলে, "তারা যেন তাদের গোপন আভরণ প্রকাশের উদ্দেশ্যে সজোরে পদক্ষেপ না করে। হে মুমিনগণ! তোমরা সকলে আল্লাহর দিকে প্রত্যাবর্তন কর, যাতে তোমরা সফলকাম হতে পার।" (সূরা নূর (২৪) : ৩১)

"(হে নবী!) মুমিন নারীদেরকে বলুন, তারা যেন তাদের দৃষ্টিকে সংযত রাখে ও তাদের লজ্জাস্থানের হিফাযত করে। তারা যেন সাধারণত যা প্রকাশ থাকে তা ছাড়া নিজেদের আভরণ প্রদর্শন না করে।"(সূরা নূর : ৩১)

---

[26]. সূরা রুম,৩০:২১

বলাবাহুল্য যে, নারীর নিজের ও নিজের সৌন্দর্যকে পরপুরুষ থেকে আড়াল রাখার সবচেয়ে সহজ ও কার্যকর উপায় হল গৃহে অবস্থান। কেননা গৃহের চার দেয়াল এবং পর পুরুষের সামনে না যাওয়া ও তাদের সঙ্গে উঠাবসা-চলাফেরা থেকে বিরত থাকাই নারীর জন্য বড় পর্দা। আর এজন্যই আল্লাহ তাআলা নারীকে আদেশ করেছেন গৃহের অভ্যন্তরে অবস্থানের। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাআ'লা ইরশাদ করেছেন,

"আর তোমরা স্বগৃহে অবস্থান করবে এবং প্রাচীন যুগের মতো নিজেদেরকে প্রদর্শন করে বেড়াবে না।" (সূরা আহযাব : ৩৩)

সুতরাং গৃহে অবস্থানই হল নারীর জন্য সবচেয়ে নিরাপদ এবং এটিই তার প্রধান কর্মক্ষেত্র। তবে প্রয়োজনে সে বাইরে যেতে পারবে।

কিন্তু বাইরে অবস্থান শুধু প্রয়োজনবশত ও প্রয়োজন পরিমাণ হতে হবে। আর এ সময়ও নিজেকে ও নিজের সৌন্দর্যকে রাখতে হবে পরপুরুষের দৃষ্টির আড়ালে। গৃহে অবস্থান নারীর ধর্মীয় অধিকার। কুরআন মজীদে নারীদেরকে গৃহাভ্যন্তরে অবস্থানের আদেশ করা হয়েছে। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাআ'লা ইরশাদ করেছেন,

(তরজমা) "আর তোমরা স্বগৃহে অবস্থান করবে এবং জাহেলী যুগের মতো নিজেদেরকে প্রদর্শন করে বেড়াবে না।"(সূরা আহযাব ৩৩: ৩৩)

এই আয়াতে গৃহকে নারীর দিকে সম্বন্ধ করা হয়েছে। এটি ছাড়া সমগ্র কুরআন মজীদে আর মাত্র দুটি আয়াত এমন আছে, যেখানে গৃহের সম্বন্ধ নারীর দিকে করা হয়েছে। গভীরভাবে লক্ষ্য করলে দেখা যাবে, নারীর দিকে গৃহের এই সম্বন্ধ তার মালিকানা বোঝানোর জন্য নয়; বরং তা নারীর জন্য সর্বদা গৃহে অবস্থান আবশ্যক হওয়ার ইঙ্গিত বহন করে। অতএব বোঝা গেল, নারীর প্রধান কর্মক্ষেত্র ও তার সকল কর্মব্যস্ততা হবে গৃহের অভ্যন্তরে। ঘরোয়া ও সাংসারিক কাজকর্মই হবে তার প্রধান কাজ। আর পুরুষের কর্মক্ষেত্র ও কর্মব্যস্ততা হবে গৃহের বাইরে।

নারী-পুরুষ প্রত্যেকের সমাজ হবে আলাদা। নারীর বিশেষ সমাজ শুধু নারীর সঙ্গে; গৃহের অভ্যন্তরে। আর পুরুষের বিশেষ সমাজ হবে শুধু পুরুষের সঙ্গে ও গৃহের বাইরে। তো ইসলামে যেহেতু নারীকে ঘরে অবস্থানের বিধান দেওয়া হয়েছে তাই সমাজের কর্তব্য, তাকে এই বিধান পালনের সুযোগ দেওয়া। চাপ প্রয়োগ করে বা বিভ্রান্তি ছড়িয়ে নারীকে এই বিধান পালনের সুযোগ থেকে বঞ্চিত করা যাবে না। এটা নারীর ধর্মীয় অধিকার।

তাছাড়া সৃষ্টি ও উদ্দেশ্য বিচারেও গৃহাভ্যন্তরে অবস্থান নারীর অধিকার। কেননা আল্লাহ তাআলা নারীকে সৃষ্টি করেছেন দুর্বল করে। তাকে সৃষ্টি করেছেন আদমের পাজর থেকে। ফলে সে আদমের (পুরুষের) একটি অংশবিশেষ। নারীকে মুখোমুখি হতে হয় ঋতুচক্রের, ধারণ করতে হয় গর্ভ, সহ্য করতে হয় প্রসব বেদনা, স্তন্যদান ও আনুষঙ্গিক দায়িত্ব। সর্বোপরি তাকে পালন করতে হয় ভবিষ্যত প্রজন্মের লালন-পালনের গুরুভার। আর এ কথা তো দিবালোকের ন্যায় স্পষ্ট যে, যে নারী অফিস-আদালত, কল-কারখানায় কাজ করে তার পক্ষে এই দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করা সম্ভব নয়। কেননা সে তো সর্বদা ব্যস্ত থাকে তার কর্মক্ষেত্রের নানা কাজে। অফিসের বিভিন্ন দায়িত্বে তাকে সময় দিতে হয়। ফলে ঘরে তার সময় দেওয়া, সন্তানদের দেখাশোনা, খোঁজখবর নেওয়া দুরূহ ব্যাপার হয়ে দাঁড়ায়।

সুতরাং সৃষ্টি-উদ্দেশ্য এবং দায়িত্ব ও কর্তব্যের বিচারেও ঘরে অবস্থানের সুযোগ নারীর প্রাপ্য। এটা তার মানবিক অধিকার। বিশেষত যখন বর্তমান সমাজে নারীর নিরাপত্তা সর্বোচ্চ ঝুঁকির সম্মুখীন। অফিস-আদালত, স্কুল-কলেজ সর্বত্রই যখন নারী অনিরাপদ। তার ইজ্জত-সতিত্ব, জীবন-প্রাণ যখন প্রতি মুহূর্তে চরম হুমকির সম্মুখীন তখন নারীর জন্য ঘরের নিরাপত্তা বলয় ছেড়ে নিজেকে নিরাপত্তাহীনতার মুখোমুখি করা, নিজের সতীত্বকে হুমকির মুখে ঠেলে দিয়ে পদে পদে উত্যক্ততা, ধর্ষণের শিকার হওয়ার কোনো যুক্তি হতে পারে না।

অথচ দুঃখজনক বাস্তবতা হল, প্রগতির দাবিদার এক শ্রেণীর বুদ্ধিজীবী ও নারীবাদী একটি গোষ্ঠি মিথ্যা আশ্বাস ও প্রলোভন দিয়ে নারীকে আজ ঘরের বাইরে নিয়ে যাচ্ছে। নিজেদের হীন স্বার্থে তারা নারীকে ও নারীর রূপ-সৌন্দর্যকে ব্যবসার পণ্যে পরিণত করছে। তারা নারীকে বোঝাচ্ছে যে, ঘরের কোণে পড়ে থাকায় কোনো স্বাধীনতা নেই। স্বামীর অনুগত থাকায় কোনো সম্মান নেই। প্রকৃত সম্মান কেবল বাইরের জীবনে। তাই পুরুষের পাশাপাশি নারীকেও উপার্জন করতে হবে। কমপক্ষে নিজের প্রয়োজন পূরণের মতো উপার্জন-উৎস তার থাকতে হবে। তবেই সে হবে প্রকৃত সুখী, প্রকৃত স্বাধীন। তারা দৃষ্টান্ত হিসেবে তুলে আনে পশ্চিমা সভ্যতাকে। যেখানে অফিস-আদালত, স্কুল-কলেজ, বাজার-শপিংমলসহ সর্বত্র নারীরা কাজ করে চলেছে।

আর অবলা নারীও প্রলুব্ধ হয়ে নির্বোধের মতোই পশ্চিমাদের অন্ধ অনুকরণে মেতে উঠেছে। প্রগতিশীল হওয়ার তাগিদে সে ঘর থেকে বের হয়ে গেছে। পুরুষের সাথে পাল্লা দিয়ে অফিস-আদালতের কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়েছে। ঘরের চার দেয়ালে আবদ্ধ

থাকাকে পরাধীনতা মনে করতে শুরু করেছে। স্বামীর অনুগত হওয়াকে অসম্মান মনে করছে।

আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে সঠিক উপলব্ধি ও জ্ঞান দান করুন। আমীন।[27]

ফিরে দেখা, ইসলাম পূর্বে নারীর অবস্থা

১. জীবন্ত কন্যাসন্তানকে দাফন: ইসলাম-পূর্ব যুগ দ্বারা উদ্দেশ্য জাহেলী যুগ, যা বিশেষভাবে আরববাসী এবং সাধারণভাবে পুরো জগতবাসী যাপন করছিল, কারণ সেটা ছিল রাসূলদের বিরতি ও পূর্বের হিদায়াত বিস্মৃতির যুগ। হাদীসের ভাষা মতে “আল্লাহ তাদের দিকে দৃষ্টি দিলেন এবং আরব ও অনারব সবার ওপর তিনি গোস্বা করলেন, তবে অবশিষ্ট কতক আহলে কিতাব ব্যতীত” ।এ সময় নারীরা বেশির ভাগ ক্ষেত্রে ও সাধারণভাবে খুব কঠিন অবস্থার সম্মুখীন ছিল। বিশেষত আরব সমাজে। মাটির নিচে তার মৃত্য ঘটে। আবার কেউ অসম্মান ও লাঞ্ছনার জীবন-যাপনে মেয়েকে বাধ্য করত। আল্লাহ তা'আলা বলেন:

وَاِذَا بُشِّرَ اَحَدُهُمۡ بِالۡاُنۡثٰى ظَلَّ وَجۡهُهٗ مُسۡوَدًّا وَّهُوَ كَظِيۡمٌ ۚ‏ ٥٨
يَتَوَارٰى مِنَ الۡقَوۡمِ مِنۡ سُوۡٓءِ مَا بُشِّرَ بِهٖ ؕ اَيُمۡسِكُهٗ عَلٰى هُوۡنٍ اَمۡ يَدُسُّهٗ فِى التُّـرَابِ ؕ اَلَا سَآءَ مَا يَحۡكُمُوۡنَ‏ ٥٩

“আর যখন তাদের কাউকে কন্যা সন্তানের সুসংবাদ দেওয়া হত, তখন তার চেহারা কালো হয়ে যায়, আর সে থাকে দুঃখ ভারাক্রান্ত। তাকে যে সংবাদ দেওয়া হয়েছে সে দুঃখে সে কওম থেকে আত্মগোপন করে। অপমান সত্তেও কি একে রেখে দেবে, না মাটিতে পুঁতে ফেলবে? জেনে রাখ, তারা যা ফয়সালা করে তা কতই না মন্দ”![28]

তিনি আরও বলেন,

وَاِذَا الۡمَوۡءٗدَةُسُئِلَتۡ‏ ٨
بِاَىِّ ذَنۡۢبٍ قُتِلَتۡ ۚ‏ ٩

“আর যখন জীবন্ত কবরস্থ কন্যাকে জিজ্ঞাসা করা হবে, কী অপরাধে তাকে হত্যা করা হয়েছে”?[29]

---

[27]. মাসিক আল কাউসার, মুহাম্মাদ আব্দুল্লাহ ফাহাদ

[28]. সুরা আন-নাহল, আয়াত: ৫৮-৫৯

[29]. সুরা আত-তাকওয়ীর, আয়াত: ৮-৯

“মাওউদাতু” সে মেয়েকে বলা হয়, যাকে জীবিত দাফন করা হয় যেন মাটির নীচে মারা যায়। কোনো কন্যা যদিও জ্যান্ত দাফন থেকে নিষ্কৃতি পেত, কিন্তু লাঞ্ছনার জীবন থেকে মুক্তি পেত না। নারীর ঘনিষ্ঠ আত্মীয়ের সম্পদ যদিও প্রচুর হত, কিন্তু তার মৃত্যুর পর নারী কখনো মিরাসের অধিকারী হত না, যদিও সে হত অভাবী ও খুব সংকটাপন্ন! কারণ তাদের নিকট পুরুষদের জন্য মিরাস খাস ছিল, নারীদের তাতে কোনো অংশ ছিল না, বরং নারীরা মৃত স্বামীর সম্পদের ন্যায় মিরাসে পরিণত হত। ফলশ্রুতিতে এক পুরুষের অধীন অনেক নারী আবদ্ধ হত, যার নির্ধারিত কোনো সংখ্যা ছিল না। একাধিক সপত্নী বা সতীন থাকার কারণে নারীরা যে সংকীর্ণতা, যুলম ও কোণঠাসা অবস্থার সম্মুখীন হত -তা এই সংক্ষিপ্ত আলোচনার মাধ্যমে ফুটিয়ে তোলা অসম্ভব ।[1] সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ২৮৬৭/৫১১৩

কন্যাসন্তান জন্মের সংবাদে পিতার অন্তরে যে কুপ্রভাব সৃষ্টি হত, তারই সংবাদভাষ্য কুর’আনে তুলে ধরে ইরশাদ হয়েছে। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাআ'লা কুরআনে বলেন,;

وَاِذَا بُشِّرَ اَحَدُہُمۡ بِمَا ضَرَبَ لِلرَّحۡمٰنِ مَثَلًا ظَلَّ وَجۡہُہٗ مُسۡوَدًّا وَّہُوَ کَظِیۡمٌ

“অথচ তাদের কাউকে যখন তার (কন্যাসন্তান জন্মের) সুসংবাদ দেয়া হয়, যাকে তারা দয়াময় আল্লাহর প্রতি আরোপ করে রেখেছে, তখন তার চেহারা মলিন হয়ে যায়।”[30]

একদিকে ফেরেশতাদের আল্লাহর কন্যা আখ্যা দিত জাহেলীরা । অর্থাৎ “পবিত্র দেবতা”র আকীদা ছিল তাদের মাঝে বিদ্যমান। অপর দিকে তাদের প্রত্যেকেই কন্যাসন্তানের পিতা হওয়াকে অবমাননাকর, অসম্মানজনক ভেবে এই অবমাননা ও অসম্মানকে নিজেদের জন্য সহনীয় মেনে নিতে তারা কখনই প্রস্তুত ছিল না। তাদের এই দ্বিমুখী নীতির প্রতি ইঙ্গিত করেই আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাআ'লা কুর'আনে ইরশাদ করেছেন;

اَفَاَصۡفٰىکُمۡ رَبُّکُمۡ بِالۡبَنِیۡنَ وَاتَّخَذَ مِنَ الۡمَلٰٓئِکَۃِ اِنَاثًا ؕ اِنَّکُمۡ لَتَقُوۡلُوۡنَ قَوۡلًا عَظِیۡمًا

“তোমাদের প্রতিপালক পুত্র সন্তান দেওয়ার জন্য তোমাদেরকে বেছে নিয়েছেন আর নিজের জন্য বুঝি ফেরেশতাদেরকে কন্যারূপে গ্রহণ করেছেন? প্রকৃতপক্ষে তোমরা বড় গুরুতর কথা বলছ।”[31]

এই বিষয়ে আরোও ইরশাদ করেন;

وَیَجۡعَلُوۡنَ لِلّٰہِ الۡبَنٰتِ سُبۡحٰنَہٗ ۙ وَلَہُمۡ مَّا یَشۡتَہُوۡنَ

[30] সূরা যুখরূফ : আয়াত -১৭

[31]. সূরা বনী ইসরাঈল আয়াত:৪০

“তারা তো আল্লাহর জন্য কন্যা সন্তান স্থির করছে। সুবহানাল্লাহ! অথচ নিজেদের জন্য (প্রার্থনা করে) তাই (অর্থাৎ পুত্র সন্তান) যা তাদের অভিলাষ মোতাবেক হয়।”[32]

সহীহ বুখারীর একটি হাদীস থেকে জানা যায়, জাহেলী যুগে নারীদের বন্ধক রাখার মত নিকৃষ্ট প্রথা চালু ছিল। মুহাম্মদ ইবনে মাসলামা (রাযি.) বলেন,

আমি যখন কাআব ইবনে আশরাফের কাছে গেলাম এবং তার কাছে খণ হিসেবে শস্য চাইলাম তখন সে বলে- 'কাআব ইবনে আশরাফ বলল, তোমরা তোমাদের নারীদের আমার কাছে বন্ধক রাখ। তখন সেই (খণ প্রত্যাশী লোকেরা) বলল, আমরা কীভাবে আপনার কাছে আমাদের নারীদের বন্ধকস্বরূপ রাখতে পারি? অথচ আপনি আরবদের মাঝে সবচেয়ে বেশি সুন্দর ব্যক্তিত্ব!”[33]

উপরোক্ত ঘটনা থেকেও আঁচ করা যায় সেই যুগের নারীরা কতটাই না নির্যাতিত ছিল। আর তাদের ইজ্জত-আব্রু ও পুতঃপবিত্রতা কতটা মূল্যহীন ছিল!

তারা দুনিয়ার ধন-সম্পদের জন্য দাস-দাসীদেরকে ব্যভিচারে বাধ্য করত কুর’আনে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাআ'লা এরশাদ করেন;

وَلۡیَسۡتَعۡفِفِ الَّذِیۡنَ لَا یَجِدُوۡنَ نِکَاحًا حَتّٰی یُغۡنِیَہُمُ اللّٰہُ مِنۡ فَضۡلِہٖ ؕ وَالَّذِیۡنَ یَبۡتَغُوۡنَ الۡکِتٰبَ مِمَّا مَلَکَتۡ اَیۡمَانُکُمۡ فَکَاتِبُوۡہُمۡ اِنۡ عَلِمۡتُمۡ فِیۡہِمۡ خَیۡرًا ٭ۖ وَّاٰتُوۡہُمۡ مِّنۡ مَّالِ اللّٰہِ الَّذِیۡۤ اٰتٰىکُمۡ ؕ وَلَا تُکۡرِہُوۡا فَتَیٰتِکُمۡ عَلَی الۡبِغَآءِ اِنۡ اَرَدۡنَ تَحَصُّنًا لِّتَبۡتَغُوۡا عَرَضَ الۡحَیٰوۃِ الدُّنۡیَا ؕ وَمَنۡ یُّکۡرِہۡہُّنَّ فَاِنَّ اللّٰہَ مِنۡۢ بَعۡدِ اِکۡرَاہِہِنَّ غَفُوۡرٌ رَّحِیۡمٌ ۝

“যাদের বিবাহ করার সামর্থ্য নেই, তারা সংযম অবলম্বন করবে, যতক্ষণ না আল্লাহ নিজ অনুগ্রহে তাদেরকে অভাবমুক্ত করেন। তোমাদের মালিকানাধীন দাস-দাসীদের মধ্যে যারা ‘মুকাতাবা’ করতে চায়, তোমরা তাদের সঙ্গে মুকাতাবা করবে যদি তাদের মধ্যে ভালো কিছু দেখ এবং (হে মুসলিমগণ!) আল্লাহ তোমাদেরকে যে সম্পদ দিয়েছেন তা থেকে তাদেরকেও দাও এবং তোমরা নিজ দাসীদেরকে দুনিয়ার ধন-সম্পদ অর্জনের জন্য ব্যভিচারে বাধ্য করো না যদি তারা পুতপবিত্র থাকতে চায়। কেউ তাদেরকে বাধ্য করলে, তাদেরকে বাধ্য করার পর (তারা ক্ষমার আশা রাখতে পারে। কেননা) আল্লাহ তো অতি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।”[34]

২. জাহেলী যুগে বিয়েঃ জাহেলী যুগেও বিয়ের নাম প্রচলন সবই ছিল কিন্তু তার অবস্থা কী ছিল? বলতে গেলে এর অধিকাংশ পদ্ধতিই ছিল যিনার।

---

[32]. সূরা নাহল: ৫৭

[33]. সহীহ বুখারী : কাআব ইবনে আশরাফ হত্যা অধ্যায়

[34]. সূরা নূরের ৩৩ নাম্বার আয়াতে

উম্মুল মুমিনীন হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রাযি.) বলেন, জাহেলী যুগে **চার** পদ্ধতির বিয়ে-শাদীর প্রচলন ছিল।

১. একটি পদ্ধতি তো তাই যা বর্তমান যুগে প্রচলিত রয়েছে।

২. স্বামী নিজের বিবাহিতা স্ত্রীর উদ্দেশ্যে বলে থাকে, তোমার ঋতু স্রাবের রক্ত আসা বন্ধ হয়ে গেলে পবিভ্রতা অর্জনের পর অমুক ব্যক্তির কাছে চলে যাও । তার থেকে স্বার্থোদ্ধার কর। অর্থাৎ ওই পরপুরুষের সঙ্গে সহবাসে লিপ্ত হত। আর স্ত্রী ওই পরপুরুষের সঙ্গে ততদিন পর্যন্ত ওই নারী থাকতে থাকে যতদিন পর্যন্ত পরপুরুষ দ্বারা তার গর্ভ প্রকাশ না পায়। এই সময়টায় স্বামী-স্ত্রী থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন থাকে । পরপুরুষের দ্বারা যখন গর্ভ ধারণ কাজ শেষ হয়ে যায় তখন স্ত্রীর প্রতি স্বামীর মনোবাসনা জাগলে সে স্ত্রীর শয্যাসঙ্গী হয়। তারা এমনটি করে থাকত একটি মহান সন্তানের প্রত্যাশায়। এটিকে “লজ্জাস্থানের বিয়ে” বলা হত। এটি মূলত সন্তান প্রজননের একটি পদ্ধতি ছিল।

৩. তৃতীয় পদ্ধতিটি ছিল, একজন নারীর কাছে বিভিন্ন পুরুষ আসত এবং তার সঙ্গে কাম চরিতার্থে নিজের মনোবাসনা পূরণ করত। তবে এর সংখ্যা থাকত ১০ এর নিচে। এরপর ওই নারীর গর্ভ প্রকাশ পেয়ে সন্তান প্রসব হত। সন্তান প্রসবের কিছুদিন পর একজন দূত পাঠিয়ে ওই নারী সবাইকে জানিয়ে একত্রিত করত। কেউ একে অস্বীকার করত না। সবাই একত্রিত হওয়ার পর ওই নারী তাদের সবার উদ্দেশ্যে বলত, তোমরা সবাই তোমাদের কর্ম সম্পর্কে ওয়াকিফহাল। তোমরা আমার সঙ্গে সহবাস করতে আসতে । এখন আমার একজন সন্তানও হয়েছে। হে অমুক ব্যক্তি! এটি তোমার সন্তান। তুমি তোমার ইচ্ছে মত এর একটি নাম রেখে নাও। এর মাধ্যমে সন্তানটি ওই ব্যক্তির হয়ে যেত, যার নাম নারী উচ্চারণ করেছে। পুরুষের অস্বীকার করার কোন জো থাকত না।

৪. কিছু নারী এমন ছিল যাদের গেইটে পতাকা টানানো থাকত। এরা পেশাধারী বাজারী মহিলা (পতিতা) হিসেবে গণ্য ছিল। যার ইচ্ছে হত তাদের কাছে যেত। তাদের কোন সন্তান জন্ম হলে যিনাকারী সব পুরুষ একত্রিত হত। একজন গণক ডাকানো হত। গণক নিজ বিদ্যা দ্বারা যাচাই-বাছাই করে যার সন্তান হিসেবে ঘোষণা করত, সন্তানটি ওই ব্যক্তিরই হয়ে যেত। ওই ব্যক্তির অস্বীকার করার কোন উপায় ছিল না।

হযরত আয়েশা (রা.) এই পদ্ধতিগুলো উল্লেখ করে বলেন, সব অবৈধ পদ্ধতিগুলো রাসুলুল্লাহ ﷺ বাতিল ঘোষণা দিয়ে বন্ধ করে দেন।

তিনি বলেন: "সত্য নিয়ে যখন মহানবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রেরিত হলেন, তখন তিনি জাহেলী যুগের প্রচলিত বিয়েগুলো বন্ধ করে দেন। একমাত্র ওই বিয়ে পদ্ধতি অক্ষুণ্ন রাখেন, যা বর্তমান সময়ে প্রচলিত আছে।"[35]

উপরোক্ত হাদীস দ্বারাও প্রতীয়মান হয় যে, জাহেলী যুগে নারীদের ইজ্জত- আব্রু, সম্ভ্রম-সম্মান আল্লাহ তাআলা প্রদত্ত প্রাপ্য থেকে ছিল বঞ্চিত। কেননা যে সমাজে স্বামী আপন স্ত্রীদের পরপুরুষ দ্বারা প্রজননের মত ঘৃণ্য অপকর্ম করার জন্য প্রেরণ করে থাকে সে সমাজের নারীদের ইজ্জত-আব্রু মানসম্মান কোন পর্যায়ে গড়িয়ে ছিল তা আঙ্গুল দ্বারা নির্দেশ করে বলতে হয় না। ঘটনাবলী দ্বারা বুঝে আসে যে, পুরুষরা এমনটি ধারণা করে নিয়েছিল, নারীরা মহরের বিনিময়ে তাদের কাছে বিক্রিত হয়ে গেছে। আর এ কারণেই তো স্বামীর মৃত্যুর পর স্ত্রীরা তার ত্যাজ্য সম্পদ হিসেবে পরিগণিত হবে।[36] কতটা নিকৃষ্ট ছিল ইসলাম পূর্ব নারীর অবস্থা।

ইসলাম আগমনের পর কুর'আনের আলোকে নারীর মর্যাদা ও অধিকার

এবার আমরা দেখি ইসলামের সুশীতল ছায়ায় এসে নারীর সম্মান ও মর্যাদা কোন স্বপ্নের চূড়ান্ত চুড়ায় উন্নীত করা হয়েছে।

ইসলাম নারীর অধিকারের সুস্পষ্ট ঘোষণায় নারীর যথাযথ মর্যাদার স্বীকৃতি দিয়েছে এবং মানবতার নবী হযরত মুহাম্মদ ﷺ সর্বপ্রথম নারী জাতির পূর্ণ মানবিক অধিকার প্রতিষ্ঠা করেছেন। যা আমরা কুরআন-হাদীসের পাশাপাশি রাসুলুল্লাহ ﷺ এর সীরাত অধ্যয়ন থেকে বিস্তারিত জানতে পারি। ইসলাম এমন একটা জীবন ব্যবস্থা যেটা মানুষের পূর্ণাঙ্গ জীবনকে কামনা করে। ইসলাম হচ্ছে আমাদের কমপ্লিট কোড অফ লাইফ।

ইসলাম নারী ও পুরুষ উভয়ের পারিবারিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক ও মানবিক অধিকার সুস্পষ্টভাবে নির্ধারণ করেছে। ইসলামী জীবনব্যবস্থায় প্রত্যেক ব্যক্তিকে তার স্বভাব, দায়িত্ব ও প্রয়োজন অনুযায়ী অধিকার ও মর্যাদা প্রদান করা হয়েছে। কোথাও নারীকে বিশেষ মর্যাদা দেওয়া হয়েছে, আবার কোথাও পুরুষকে নির্দিষ্ট দায়িত্ব ও নেতৃত্বের

[35]. সহীহ বুখারী : মিসরী ছাপা, বিয়ে অধ্যায়, খণ্ড ৪, পৃষ্ঠা ১৬৫

[36]. তথ্যসূত্র: htttps://muslimpost.net

অবস্থান প্রদান করা হয়েছে। ইসলামী দৃষ্টিতে এটি বৈষম্য নয়; বরং ন্যায় ও প্রজ্ঞার ভিত্তিতে দায়িত্ব ও অধিকারের সুষম বণ্টন। কারণ আল্লাহ তাআলাই মানবজাতির স্রষ্টা এবং তিনি সর্বাধিক অবগত যে, কোন ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর জন্য কোন বিষয় কতটুকু উপযোগী ও প্রয়োজনীয়।

ইসলাম কেবল একটি ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানের নাম নয়; বরং এটি একটি পূর্ণাঙ্গ জীবনব্যবস্থা। মানবজীবনের ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও রাষ্ট্রীয় সকল ক্ষেত্রের জন্য ইসলাম দিকনির্দেশনা প্রদান করেছে। মানুষের দৈনন্দিন জীবনযাপন থেকে শুরু করে বৃহত্তর সমাজ ও রাষ্ট্র পরিচালনা পর্যন্ত প্রয়োজনীয় নীতিমালা ইসলামে বিদ্যমান। ফলে নারী-পুরুষের অধিকার ও দায়িত্বের প্রশ্নেও ইসলাম একটি ভারসাম্যপূর্ণ ও সামগ্রিক দৃষ্টিভঙ্গি উপস্থাপন করে।

যখন ইসলামকে কেবল কিছু ধর্মীয় রীতি-নীতির মধ্যে সীমাবদ্ধ করে দেখা হয়, তখন এর পূর্ণাঙ্গ জীবনদর্শন আড়ালে থেকে যায়। এর ফলে অধিকার, দায়িত্ব, ন্যায়বিচার ও সামাজিক ভারসাম্য সম্পর্কে বিভ্রান্তি সৃষ্টি হতে পারে। পক্ষান্তরে ইসলামের সামগ্রিক দৃষ্টিভঙ্গি অনুধাবন করা গেলে স্পষ্ট হয় যে, নারী ও পুরুষের অধিকার ও দায়িত্ব নির্ধারণে ইসলাম ন্যায়, ভারসাম্য এবং মানবকল্যাণকেই সর্বাধিক গুরুত্ব দিয়েছে।

আফসোসের বিষয় হলো, আজ নারীর অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য বিভিন্ন আন্দোলন ও মতবাদকে অপরিহার্য হিসেবে উপস্থাপন করা হয়, অথচ ইসলাম প্রায় চৌদ্দশত বছর পূর্বেই নারীর অধিকার ও মর্যাদার বিষয়ে সুস্পষ্ট দিকনির্দেশনা প্রদান করেছে। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তাআলা নারীদের অধিকার, দায়িত্ব, পারিবারিক মর্যাদা, উত্তরাধিকার, বিবাহ ও সামাজিক অবস্থান সম্পর্কিত বিধান বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করেছেন। এ বিষয়ে বিশেষ গুরুত্বের প্রমাণ হিসেবে কুরআনে **"আন-নিসা" (নারীগণ)** নামে একটি পূর্ণাঙ্গ সূরা নাযিল করা হয়েছে, যেখানে নারীদের অধিকার ও সংশ্লিষ্ট বহু বিধান আলোচনা করা হয়েছে।

সূরা আন-নিসার প্রথমাংশে বিশেষভাবে পারিবারিক জীবন, বিবাহ, মহর, উত্তরাধিকার, এতিম ও নারীদের অধিকার সম্পর্কিত গুরুত্বপূর্ণ আইন ও বিধান উল্লেখ করা হয়েছে। এটি প্রমাণ করে যে ইসলাম নারীকে অবহেলা করেনি; বরং তাকে একটি সম্মানিত ও সুরক্ষিত অবস্থান প্রদান করেছে। জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত একজন নারী কন্যা, বোন, স্ত্রী ও মা—প্রতিটি পরিচয়ে ইসলামে মর্যাদা ও অধিকার লাভ করে। ইসলামের দৃষ্টিতে নারী সমাজের বোঝা নয়, বরং পরিবার ও সভ্যতার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ভিত্তি।

অতএব, নারীর অধিকার ও মর্যাদার প্রশ্নে ইসলামকে কেবল একটি ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানের সমষ্টি হিসেবে নয়, বরং একটি পূর্ণাঙ্গ জীবনব্যবস্থা হিসেবে মূল্যায়ন করা প্রয়োজন। কারণ নারীর সম্মান, নিরাপত্তা ও ন্যায়সঙ্গত অধিকার নিশ্চিত করার জন্য ইসলামে যে বিধানসমূহ প্রদান করা হয়েছে, তা মানবজাতির জন্য এক ভারসাম্যপূর্ণ ও কল্যাণকর নির্দেশনা।

এই সূরার প্রথম থেকে ৩৪ নম্বর আয়াত আলোচনা হয়েছে যে বিষয়গুলো নিয়ে তার অধিকাংশই নারীর অধিকার সম্পর্কিত বিধান,মানে আইন।

- মানবজাতির উৎস হিসেবে নারীর মর্যাদা ।
- এতীমের ব্যাপারে বিধান।
- এতীম মেয়েদের বিয়ের ব্যাপারে বিধানা।
- বহুবিবাহ সীমিতকরণ, আগে ছিল লাগামছাড়া। এখন লাগাম দেওয়া হলো।
- একবিবাহ উদ্ধদ্্করণ
- স্ত্রীর মোহর পাবার অধিকার (সিকিউরিটি মানি হিসেবে) ও ভরণপোষণের অধিকার
- নারীর সম্পত্তিতে উত্তরাধিকার প্রবর্তন।
- নারীর উপর ব্যভিচারের মামলা কঠিন করা হলো যাতে চাইলেই অপবাদ দেওয়া না যায় নারীকে।
- নারী মৃতব্যক্তির সম্পত্তি গণ্য হত। ওয়ারিশ তাকে জোর করে বিয়ে করত বা টাকার বিনিময়ে অন্যত্র বিয়ে দিত। পুরুষ নিজেকে নারীর জানমালের মালিক ভাবত। এটাকে এবং এই মানসিকতা থেকে যত জুলুম হতে পারে সেগুলো হারাম করা হলো।
- কোন কোন নারীকে বিবাহ করা যাবে না সে বিধান দেওয়া হলো। আগে সৎমাকে বিয়ে করার ন্যাক্কারজনক রীতি ছিল।

শুধু মাত্র সূরা নিসায় নয় আল্লাহ সুবহানাতায়ালা আরও অন্যান্য সূরায় নারী জাতিকে পুরুষজাতির সাথে পুরুষজাতের সহযোগী পরিপূরক এবং একজন আরেকজনের পোশাক এমন অনেক অনেক রূপক অর্থে নারীর অধিকারকে বারবার বর্ণনা করেছেন যা আমরা চোখ বন্ধ করে উপেক্ষা করে যাচ্ছি।

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাআ'লা কুর’আনে এরশাদ করেন:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنَّا خَلَقۡنَٰكُم مِّن ذَكَرٖ وَأُنثَىٰ وَجَعَلۡنَٰكُمۡ شُعُوبٗا وَقَبَآئِلَ لِتَعَارَفُوٓاْۚ

'হে মানুষ! আমি তোমাদের সকলকে এক পুরুষ ও এক নারী হতে সৃষ্টি করেছি এবং তোমাদেরকে বিভিন্ন জাতি ও গোত্রে বিভক্ত করেছি, যাতে তোমরা একে অন্যকে চিনতে পার।'[37]

এখানে আল্লাহ বলেছেন যে, মানব সৃষ্টির শুরু থেকে নারী পুরুষের সঙ্গী, যেমন সে পুরুষের সঙ্গী নেকি প্রাপ্তি ও শাস্তির ক্ষেত্রে।

আল্লাহ তা'আলা আরও বলেন:

مَنۡ عَمِلَ صَٰلِحٗا مِّن ذَكَرٍ أَوۡ أُنثَىٰ وَهُوَ مُؤۡمِنٞ فَلَنُحۡيِيَنَّهُۥ حَيَوٰةٗ طَيِّبَةٗۖ وَلَنَجۡزِيَنَّهُمۡ أَجۡرَهُم بِأَحۡسَنِ مَا كَانُواْ يَعۡمَلُونَ ٩٧

'যে ব্যক্তিই মুমিন থাকা অবস্থায় সৎকর্ম করবে, সে পুরুষ হোক বা নারী, আমি অবশ্যই তাকে উত্তম জীবন যাপন করাব এবং তাদেরকে তাদের উৎকৃষ্ট কর্ম অনুযায়ী তাদের প্রতিদান অবশ্যই প্রদান করব।'[38]

অপর একটি আয়াতে আছে;

لِّيُعَذِّبَ ٱللَّهُ ٱلۡمُنَٰفِقِينَ وَٱلۡمُنَٰفِقَٰتِ وَٱلۡمُشۡرِكِينَ وَٱلۡمُشۡرِكَٰتِ وَيَتُوبَ ٱللَّهُ عَلَى ٱلۡمُؤۡمِنِينَ وَٱلۡمُؤۡمِنَٰتِۗ وَكَانَ ٱللَّهُ غَفُورٗا رَّحِيمَۢا ٧٣

'পরিণামে আল্লাহ মুনাফেক পুরুষ ও মুনাফেক নারী এবং মুশরিক পুরুষ ও মুশরিক নারীদেরকে শাস্তিদান করবেন আর মুমিন পুরুষ ও মুমিন নারীদের প্রতি রহমতের দৃষ্টি দান করবেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ অতি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।' [39]

আল্লাহ তা'আলা মৃত ব্যক্তির সম্পদের ন্যায় নারীকে পরিত্যক্ত মিরাস গণ্য করা হারাম করেন। যেমন তিনি বলেন:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا يَحِلُّ لَكُمۡ أَن تَرِثُواْ ٱلنِّسَآءَ كَرۡهٗاۖ

'হে মুমিনগণ! তোমাদের জন্য এটা হালাল নয় যে, তোমরা জোরপূর্বক নারীদের মালিক বনে বসবে।' [40]

---

[37]. সূরা হুজরাত: ১৩
[38]. সূরা, নাহল: ৯৭
[39]. সূরা আহযাব, ৩৩:৭৩
[40]. সূরা আন নিসা, ৪:১৯

এভাবে ইসলাম নারীর ব্যক্তি স্বাধীনতা পুনরুদ্ধার করে তাকে ওয়ারিশ হিসেবে ঘোষণা দেয়। কারণ, সে পরিত্যক্ত সম্পদ নয়। মৃত ব্যক্তির নিকট আত্মীয়ের পরিত্যক্ত সম্পদ থেকে মিরাসের হক প্রদান করে তাকে।

আল্লাহ তা'আলা বলেন:

لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا

পুরুরুষদের জন্যও সেই সম্পদে অংশ রয়েছে, যা পিতা-মাতা ও নিকটতম আত্মীয়বর্গ রেখে যায় আর নারীদের জন্যও সেই সম্পদে অংশ রয়েছে, যা পিতা-মাতা ও নিকটতম আত্মীয়বর্গ রেখে যায়, চাই সে (পরিত্যক্ত) সম্পদ কম হোক বা বেশি। এ অংশ (আল্লাহর তরফ থেকে) নির্ধারিত।' [41]

এ আয়াতে আল্লাহ তাআলা ঈমান, আমল, দায়িত্ব ও জবাবদিহিতার ক্ষেত্রে নারী ও পুরুষ উভয়ের অবস্থান স্পষ্টভাবে তুলে ধরেছেন। মুমিন পুরুষ ও মুমিন নারী যেমন আল্লাহর রহমত ও ক্ষমার অধিকারী, তেমনি মুনাফিক ও মুশরিক পুরুষ-নারী তাদের কর্ম অনুযায়ী শাস্তির মুখোমুখি হবে। এর মাধ্যমে প্রতীয়মান হয় যে ইসলামে আধ্যাত্মিক মর্যাদা ও আল্লাহর নিকট গ্রহণযোগ্যতার মূল ভিত্তি হলো ঈমান ও সৎকর্ম, লিঙ্গ নয়।

অপর আয়াতে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাআ'লা বলেন;

يُوْصِيْكُمُ اللّٰهُ فِيْٓ اَوْلَادِكُمْ * لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْاُنْثَيَيْنِ ۚ فَاِنْ كُنَّ نِسَآءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۚ وَاِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ؕ

"আল্লাহ তোমাদেরকে তোমাদের সন্তানদেরকে ক্ষেত্রে নির্দেশ দিচ্ছেন, এক ছেলের জন্য দুই মেয়ের অংশের সমপরিমাণ । তবে যদি তারা দুইয়ের অধিক মেয়ে হয়, তাহলে তাদের জন্য হবে, যা সে রেখে গছে তার তিন ভাগের দুই ভাগ, আর যদি একজন মেয়ে হয় তখন তার জন্য অর্ধেক ..." ।[42]

এভাবে আল্লাহ নারীকে একজন মা, মেয়ে, বোন ও স্ত্রী হিসেবে মিরাস দান করেন। আর বিবাহের ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ চারজন স্ত্রী রাখার অনুমতি প্রদান করেন, শর্ত হচ্ছে নারীদের মাঝে ইনসাফ প্রতিষ্ঠা ও তাদের সাথে প্রচলিত রেওয়াজ মোতাবেক আচরণ করতে হবে। অধিকন্তু নারীর জন্য পুরুষের ওপর দেন-মোহর অবধারিত করে তাকে তা পরিপূর্ণ প্রদান করার নির্দেশ দেন, তবে নারী যদি স্বেচ্ছায় ও পূর্ণ সন্তুষ্টিতে কিছু হক ত্যাগ করে সেটা পুরুষের জন্য বৈধ।

---

41. সূরা আল আহযাব, ৩৩:৭৩

42. সূরা আন নিসা, ৪:১১

আল্লাহ তা'য়ালা বলেন:

وَءَاتُوا النِّسَاءَ صَدُقَٰتِهِنَّ نِحْلَةً ۚ فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيٓـًٔا مَّرِيٓـًٔا

'নারীদেরকে খুশী মনে তাদের মাহর আদায় কর। তারা নিজেরা যদি স্বতঃস্ফূর্তভাবে তার কিছু অংশ ছেড়ে দেয়, তবে তা সানন্দে, স্বচ্ছন্দভাবে ভোগ করতে পার।'[43]

ইসলাম নারীকে তার স্বামীর ঘরে আদেশ ও নিষেধকারী জিম্মাদার এবং স্বীয় সন্তানের ওপর কর্তৃত্বকারী অভিভাবক বানিয়েছে। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন:

وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ عَلَى بَيْتِ زَوْجِهَا وَوَلَدِهِ، وَهِيَ مَسْؤُولَةٌ عَنْهُم ْ

"নারী তার স্বামীর ঘর ও সন্তানের তত্ত্বাবধায়ক, এবং সে তাদের সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবে।"[44]

রেওয়াজ মোতাবেক নারীর খরচ ও পোশাক-পরিচ্ছদ প্রদান করা স্বামীর ওপর ওয়াজিব করেছেন।

উপরের আয়াত গুলোতে যা পেলাম;

- সৃষ্টিকুলের জন্য নারী ও পুরুষ সমান প্রয়োজনীয়।
- নেক ও বদ কাজে নারী ও পুরুষের কাজ অনুযায়ী অংশ।
- মিরাস নির্দিষ্ট করেছেন যা ইসলাম পূর্ব যুগে ছিলনা উল্টো তারা নারীকেই মিরাস হিসেবে ভাগ করে নিতো।
- মোহরানার অধিকার।

এবার ধাপে ধাপে বিস্তারিত আলোচনার করা চেষ্টা করবো ইন শা আল্লাহ ;

(ক) বিবাহের মাধ্যমে নারীকে অধিকার ও মর্যাদা দান:

জাহিলী যুগে বৈবাহিক ক্ষেত্রে নারীদের কোনরূপ অধিকার ছিল না। তারা শুধু পুরুষের ভোগের সামগ্রী ছিল। ইসলাম এহেন ঘৃণিত প্রথার মূলোৎপাটন করতঃ নারী ও পুরুষের বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপনের নির্দেশ দিয়েছে। এ মর্মে আল্লাহ তা'আলা এরশাদ করেন,

فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا

"তবে যেসব নারী তোমাদের পছন্দ হয়, তাদের মধ্যে থেকে দুই দুই, তিন তিন, চার চার জনকে বিবাহ কর। কিন্তু তোমাদের মনে যদি আশংকা জাগে যে, তোমরা তাদের

---

[43]. সূরা আন নিসা ৪:৪

[44]. সহীহ বুখারীর আরবি (হাদিস নং ৮৯৩)

সাথে ইনসাফ করতে পারবে না। তাহলে একজন স্ত্রী গ্রহণ কর অথবা তোমাদের দাসীদেরকে স্ত্রী হিসেবে গ্রহণ কর। অবিচার হতে বাঁচার জন্য এটাই অধিকতর সঠিক কৌশল"[45]

(খ) স্বামী নির্বাচনের স্বাধীনতায় নারীকে অধিকার ও মর্যাদা দান:

ইসলামের আবির্ভাবের পূর্বে নারীদের পছন্দমত স্বামী গ্রহণের কোন অধিকার ছিল না। যখন-তখন তাদেরকে পাঞ্জুরে করা হত। কিন্তু ইসলাম নারীকে স্বামী নির্বাচনের স্বাধীনতা দিয়েছে। যে কেউ ইচ্ছা করলে বলপূর্বক কোন নারীর স্বামী হতে পারবে না। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ

"হে পুরুষরা! তোমরা মহিলাদেরকে (স্বীয় স্বামী নির্বাচন করে) বিয়ে করতে বাধা প্রদান করো না"[46]

হাদীছে এরশাদ হয়েছে,

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لَا تُنْكَحُ الأَيِّمُ حَتَّى تُسْتَأْمَرَ وَلَا تُنْكَحُ الْبِكْرُ حَتَّى تُسْتَأْذَنَ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَكَيْفَ إِذْنُهَا قَالَ أَنْ تَسْكُتَ

আর আবু হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, "স্বামীহীনা নারীর বিবাহ তার অনুমতি ব্যতীত দেওয়া যাবে না। কুমারীর বিবাহ তার সম্মতি ব্যতীত দেওয়া চলবে না।" তারা (উপস্থিত সাহাবায়ে কেরাম) জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহর রাসূল (সা.)! কুমারীর সম্মতি কিরূপে (নেওয়া যাবে)? উত্তরে তিনি বললেন, "তার নীরবতাই সম্মতি।"[47]

(গ) স্ত্রী হিসাবে নারীকে অধিকার ও মর্যাদা দান:

ইসলাম পারিবারিক জীবনে নারীকে দিয়েছে তার ন্যায্য অধিকার। সংসার জীবনে নারী-পুরুষ পরস্পরের পরিপূরক। কোন একজনের একক প্রচেষ্টায় সংসার জীবন পূর্ণতা লাভ করতে পারে না। মহান আল্লাহ এরশাদ করেন,

هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَّهُن

'তারা তোমাদের পোশাক এবং তোমরা তাদের পোশাক'[48]

রাসুলুল্লাহ ﷺ বলেন,

[45]. সূরা আন নিসা, ৪:৩
[46]. সূরা বাকারাহ, ২:২৩২
[47]. বুখারী ও মুসলিম, মিশকাত হা/৩১২৬
[48]. সূরা বাকারাহ, ২:১৮৭

‘তোমাদের মধ্যে সেই উত্তম চরিত্রের অধিকারী, যে তার স্ত্রীর কাছে উত্তম। আর আমি তোমাদের মধ্যে নিজ স্ত্রীর কাছে উত্তম।’[49]

শুধু তাই নয়, রাসুলুল্লাহ ﷺ তার বৈবাহিক জীবনে বাস্তব দৃষ্টান্ত পেশ করে পুরুষদের শিক্ষা দিয়েছেন যে, স্ত্রীর সম্মান ও অধিকার কিভাবে প্রদান করতে হবে। আর স্ত্রীদের প্রতি সদাচরণ প্রসঙ্গে আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

‘তোমরা তাদের সাথে সদভাবে জীবন-যাপন করো’[50]

(ঘ) মোহর দানের মাধ্যমে নারীর অধিকার ও মর্যাদা দান:

ইসলাম নারীর মর্যাদার স্বীকৃতি স্বরূপ বিবাহের ক্ষেত্রে মোহর প্রদান অপরিহার্য করে দিয়েছে। আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً

‘তোমরা তোমাদের স্ত্রীদেরকে মোহর দিয়ে দাও সন্তুষ্টির সাথে’[51]

রাসুলুল্লাহ ﷺ এরশাদ করেন, ‘যে শর্ত পূর্ণ করা সবচেয়ে জরুরী তা হলো ঐ শর্ত- যা দ্বারা তোমরা (স্ত্রী) লজ্জাস্থান হালাল করো। অর্থাৎ মোহর।’[52]

(ঙ) সহবাসের ক্ষেত্রে নারীকে অধিকার ও মর্যাদা দান:

সহবাসের ক্ষেত্রে নারীর শারীরিক কষ্টের বিষয়টি খেয়াল রেখে ঋতুবতী অবস্থায় স্ত্রীর সাথে মেলামেশা ইসলাম নিষিদ্ধ করেছে।

আল্লাহ তা'য়ালা বলেন,

وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّىٰ يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ

‘হে রাসুল (ﷺ)! লোকেরা আপনার নিকট মহিলাদের ঋতু সম্পর্কে জিজ্ঞেস করে। আপনি বলে দিন, এটা একটি কষ্টদায়ক বিষয়। অতএব তোমরা ঋতুবতী অবস্থায় মহিলাদের সাথে সহবাস থেকে বিরত থাক। তারা পবিত্র হওয়া পর্যন্ত তাদের নিকটেও যেও না। যখন তারা (স্নানপূর্বক) পবিত্র হবে তখন তোমরা তাদের কাছে যাও, যেভাবে

49. তিরমিযী, মিশকাত হা/৩২৫২ সনদ সহীহ্
50. সূরা আন নিসা, ৪:১৯
51. সূরা আন নিসা, ৪:৪
52. [বুখারী ও মুসলিম, বুলূগুল মারাম, হা/৯৮৪]

আল্লাহ তা‘আলা তোমাদেরকে হুকুম করেছেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ তওবাকারী ও পবিত্রতা অর্জনকারীকে ভালবাসেন।’[53]

পায়ুপথে সহবাস করা হারাম। তা ছাড়া পুরুষরা স্ত্রীদের যেদিক থেকে ইচ্ছা সহবাস করতে পারে। আল্লাহ এ প্রসঙ্গে বলেন,

نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّىٰ شِئْتُمْ

‘তোমাদের স্ত্রীরা তোমাদের জন্য শস্যক্ষেত্র স্বরূপ। অতএব তোমাদের যেভাবে ইচ্ছা সেভাবে শস্যক্ষেত্রে গমন কর’[54]

হাদীছে এসেছে,

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ كَانَتِ الْيَهُودُ تَقُولُ إِذَا أَتَى الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ مِنْ دُبُرِهَا فِي قُبُلِهَا كَانَ الْوَلَدُ أَحْوَلَ فَنَزَلَتْ نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ

জাবির (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন যে, ইহুদীরা বলত, পুরুষ যদি পশ্চাদ্দিক হতে স্ত্রীর যৌনাঙ্গে সঙ্গম করে তাহলে সন্তান ট্যারা হয়। (তাদের এ ভ্রান্ত ধারণা নিরসনের উদ্দেশ্যে) কুর’আনে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাআ'লা বলেন,

نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ

‘তোমাদের স্ত্রীগণ তোমাদের শস্যক্ষেত্র। অতএব তোমরা তোমাদের শস্যক্ষেত্রে যেভাবে ইচ্ছা গমন করতে পার’[55]

প্রথমত, ক্ষেতের ফসল চাষীর ভবিষ্যতের পাথেয়। ঠিক তেমনই স্ত্রীর গর্ভজাত সন্তান পুরুষের বৃদ্ধ বয়সের অবলম্বন।

দ্বিতীয়ত, চাষী শষ্যক্ষেত্রের যত্ন নেয়, বীজ বোনে, নিড়ানি দেয়, সার দেয়, সেচ দেয় ক্ষেত্রেই তার সারাদিন কাটে। স্ত্রীও তেমনি সারাদিন স্বামীর মনোজগৎ জুড়ে থাকবে। স্বামীও স্ত্রীর যত্ন নেবেন, তার সুযোগ সুবিধা রোগশোক এসবের প্রতি খেয়াল রাখবেন।

তৃতীয়ত, চাষী তার জমি ডিফাইন করে, আইল দেয়- যে 'এটা আমার জমি'। সেখানে অন্য কারো হস্তক্ষেপ সে সহ্য করে না। এর জন্য সে সব করতে প্রস্তুত। মামলা মোকদ্দমা থেকে শুরু করে মারপিট- সব। জীবনদিতেও তৈরি, জীবন নিতেও তৈরি। স্ত্রীও স্বামীর কাছে এমন রত্ন। যেকোন গুলো সে সন্ত্রীকে রাক্ষা করবে। অধিকারবোধের কারণে স্ত্রীর বিষয়ে কারো হস্তক্ষেপ তার কাছে অসহ্য হবে। 'ও শুধুই আমার' -এই অনুভূতি কাজ করবে স্ত্রীর প্রতি।

53. সূরা বাকারাহ্, ২:২২২

54. সূরা বাকারাহ্, ২:২২৩

55 তাফসীরঃ বুখারী ও মুসলিম, মিশকাত হা/৩১৮৩; ইবনু মাজাহ হা/১৯২৫।

জমিটুকু চাষীর সম্বল। ওটাই তার দুনিয়া। পরম নির্ভরতা ও আবেগের জায়গা। চাষীর ২৪ ঘণ্টার সব সাধ্য-সাধনা-সুপ্ত-বেদনা তার জমিটুকু ঘিরে।তার সব ভাবনা-চিন্তা-কল্পনা তার জমির জন্য। স্বামীর কাছে স্ত্রীর মর্যাদা ও আবেদনও এমন। স্ত্রী তার স্বামীর গর্বের ধন, তার আশ্রয়-সম্বল, স্ত্রী স্বামীর কাছে তার দুনিয়া, তার সবকিছু । আচ্ছা রবীন্দ্রনাথের 'হৈমন্তী' গল্পের সবচেয়ে জোশ লাইন কোনটা ছিল বলতে পারবেন?

-'সে আমার সম্পত্তি নয়, সে আমার সম্পদ’

এটাই তো তাই না? বলতে পেরেছেন?

হে হে বন্ধুরা, রবীন্দ্রনাথ বললে ঠিক আছে। সাহিত্যের চরম উৎকর্ষ। একই জিনিস আল্লাহ শস্যক্ষেত্রের উপমা দিয়ে বুঝাতে চাচ্ছেন। এত প্রশ্ন? ডাবল স্ট্যান্ডার্ড আর কতকাল?

কুরআন এখনো নতুন, চিরনতুন। ইসলাম তখনো নারীর অধিকার নিয়ে বলেছে, এখনো বলছে; যেটুকু অধিকার পেলে নারী সত্তাগতভাবে ভালো থাকবে। নারীর নারীত্ব ভালো থাকবে। ইসলামের ডেফিনেশনের বাইরে যদি কেউ অধিকার দিতে চায়, সেটা অধিকার নয়, সেটা ফাঁদ। যে ফাঁদে আটকে ছটফট করবে নারীর নারীত্ব। যে নারীত্বের উপর নির্ভর করে পুরোটা সমাজ, ভবিষ্যত প্রজন্ম। ইসলাম এখনো আধুনিকই আছে শুধু চোখ থেকে উপনিবেশিক মনিবদের চশমাটা সরাতে হবে।

আবার মূল টপিকে ফিরে যাওয়া যাক!

(চ) মা হিসেবে নারীর সম্মান দান:

পৃথিবীতে আল্লাহ ও রাসুলুল্লাহ ﷺ এর পর সবচেয়ে বড় মর্যাদাবান হচ্ছে গর্ভধারিণী মা। কুর'আনে বারবার বলা হয়েছে সে কথা। যেমন আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাআ'লা ইরশাদ করেন,

وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا ۚ إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا

'তোমার পালনকর্তা আদেশ করেছেন যে, তাঁকে ছাড়া অন্য কারও এবাদত করো না এবং পিতা-মাতার সঙ্গে সদ্ব্যবহার করো। তাদের মধ্যে কেউ অথবা উভয়েই যদি তোমার জীবনশায় বার্ধক্যে উপনীত হয়; তবে তাদেরকে "উফ" শব্দটিও বলো না এবং তাদেরকে ধমক দিও না এবং বলো তাদেরকে শিষ্টাচারপূর্ণ কথা।'[56]

হাদিসেও স্পষ্ট করা হয়েছে বিষয়টি। আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত,

'এক ব্যক্তি নবীজি ﷺ এর কাছে এসে জিজ্ঞাসা করল, হে আল্লাহর রাসূল, কে আমার সদ্ব্যবহার ও সঙ্গসুখ পাওয়ার সবচেয়ে বেশি অধিকার রাখেন? নবীজি ﷺ বললেন, 'তোমার মা।' সে জিজ্ঞাসা করল, তারপর কে? তিনি বললেন, 'তোমার মা।' সে আবার জিজ্ঞাসা করল, তারপর কে? তিনি আবার বললেন, 'তোমার মা।' সে পুনরায় জিজ্ঞাসা করল, তারপর কে? তিনি বললেন, 'তোমার পিতা।'[57]

(ছ) কন্যা হিসেবে মর্যাদা দান:

ইসলামপূর্ব যুগে কন্যাসন্তান জন্মকে পাপ মনে করা হতো। কন্যাকে জীবন্ত কবর দেওয়ার দৃষ্ট ছিল। ইসলাম সে প্রথা উচ্ছেদ করে কন্যা জন্মকে সৌভাগ্যে পরিণত করেছে। এই বর্বরপ্রথা সম্পর্কে হুশিয়ারি দিয়ে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাআ'লা বলেছেন,

وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ
يَتَوَارَىٰ مِنَ الْقَوْمِ مِن سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ ۚ أَيُمْسِكُهُ عَلَىٰ هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ ۗ أَلَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ

"যখন তাদের কাউকে কন্যাসন্তানের সুসংবাদ দেওয়া হয়, তখন তার মুখ কালো হয়ে যায় এবং অসহ্য মনস্তাপে ক্লিষ্ট হতে থাকে । তাকে শোনানো সুসংবাদের দুঃখে সে লোকদের কাছ থেকে মুখ লুকিয়ে থাকে । সে ভাবে, অপমান সহ্য করে তাকে থাকতে

---

[56]. সূরা বনী ইসরাঈল: ২৩

[57]. (বুখারী: ৫৯৭১)

দেবে, না তাকে মাটির নিচে পুঁতে ফেলবে । শুনে রাখো, তাদের ফয়সালা খুবই নিকৃষ্ট।'[58]

কন্যাসন্তান লালন-পালনে উদ্দদ্ধ করে বর্ণিত হয়েছে অনেক হাদিস। যেমন- হযরত আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ ﷺ বলেন, "যে ব্যক্তি দুটি কন্যার লালন-পালন তাদের সাবালিকা হওয়া অবধি করবে, কিয়ামতের দিন আমি এবং সে এই দুটি আঙুলের মতো পাশাপাশি আসব ।" অতঃপর তিনি তাঁর আঙুলগুলো মিলিত করে দেখালেন।[59]

(জ) বোন হিসেবে নারীর সম্মান:

আবু সাঈদ খুদরি (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেন,

»مَنْ كَانَ لَهُ ثَلَاثُ بَنَاتٍ أَوْ ثَلَاثُ أَخَوَاتٍ، أَوِ ابْنَتَانِ أَوْ أُخْتَانِ، فَأَحْسَنَ صُحْبَتَهُنَّ وَاتَّقَى اللَّهَ فِيهِنَّ، فَلَهُ الْجَنَّةُ«

"যার তিনটি কন্যা বা তিনজন বোন, অথবা দুটি কন্যা বা দুজন বোন থাকবে, আর সে তাদের সঙ্গে উত্তম আচরণ করবে এবং তাদের ব্যাপারে আল্লাহকে ভয় করবে, তার জন্য রয়েছে জান্নাত।"[60]

(ঝ) বিধবা নারীর সম্মান:

বিধবা নারীরা অনেক সমাজেই অবহেলা ও অনিরাপত্তার শিকার হয়ে থাকে। ইসলাম তাদের মর্যাদা, নিরাপত্তা ও ভরণ-পোষণের বিষয়কে অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করেছে। বিধবা ও অসহায় নারীদের সহযোগিতা করাকে ইসলাম একটি মহৎ ইবাদত হিসেবে গণ্য করে। এ প্রসঙ্গে আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ ﷺ বলেছেন:

»السَّاعِي عَلَى الْأَرْمَلَةِ وَالْمِسْكِينِ كَالْمُجَاهِدِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ«

"যে ব্যক্তি বিধবা ও দরিদ্রের কল্যাণে পরিশ্রম করে, সে যেন আল্লাহর পথে জিহাদকারীর ন্যায়।" বর্ণনাকারী বলেন, তিনি আরও বলেছেন, "সে সেই ব্যক্তির ন্যায়, যে নিরলস নামাজ আদায় করে এবং সেই রোজাদারের ন্যায়, যে কখনো রোজা ভঙ্গ করে না।"[61]

ইসলাম নারীকে কেবল একটি নির্দিষ্ট পরিচয়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখেনি; বরং কন্যা, বোন, স্ত্রী, মা এবং বিধবা—প্রতিটি অবস্থায় তার জন্য পৃথক মর্যাদা, অধিকার ও নিরাপত্তার ব্যবস্থা করেছে। এমন এক সময়ে ইসলাম নারীর অধিকার প্রতিষ্ঠা করেছে,

---

58. সূরা নাহল, আয়াত: ৫৮-৫৯
59. (মুসলিম: ২৬৩১)
60. আল-জামি' আত তিরমিযী: ১৯১৬
61. সহিহ আল-বুখারি, হাদিস নং: ৫৩৫৩

যখন পৃথিবীর বহু সমাজে নারী ছিল অবহেলিত ও বঞ্চিত। নারীর মানবিক মর্যাদা, সম্পত্তির অধিকার, উত্তরাধিকার, পারিবারিক নিরাপত্তা এবং সামাজিক সম্মান নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে ইসলামের অবদান ইতিহাসে অনন্য।

তাই নারীর অধিকার বিষয়ে ইসলামের অবস্থান যথাযথভাবে অনুধাবন করতে হলে অন্যান্য ধর্ম ও সভ্যতার সাথেও তুলনামূলক আলোচনা প্রয়োজন, যাতে ইসলামের প্রদত্ত অধিকার ও মর্যাদার স্বাতন্ত্র্য আরও সুস্পষ্টভাবে ফুটে ওঠে।

বিভিন্ন ধর্মে নারীর অবস্থা ও অধিকার

ইসলাম নারীকে যে সম্মান ও মর্যাদার আসনে সমাসীন করেছেন সে কথা সম্যকভাবে উপলব্ধি করতে হলে আমাদের একটু অতীত ইতিহাসের দিকে ফিরে যেতে হবে। খুঁজে দেখতে হবে ইসলামপূর্ব যুগে নারীর সামাজিক অবস্থান কী ছিল!

হিন্দু ধর্মে

হিন্দু ধর্মে নারীদেরকে বলী দেওয়া এবং এ ধর্মে সতীদাহ প্রথা প্রচলিত ছিলো। এছাড়াও এ ধর্মে নারীরা পিতার সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত। হিন্দু ধর্মে নারীদের অতীব হীন ও নীচু স্তরের প্রাণী মনে করা হত। এ দিকে ইঙ্গিত করেই Professor India গ্রন্থে বলা হয়েছে,

There is no creature more sinful than woman. Woman is burning fire. She is the sharp edge of the razor she is verily all there in a body.

অর্থাৎ "নারীর ন্যায় এত পাপ-পঙ্কিলতাময় প্রাণী জগতে আর নেই। নারী প্রজ্বলিত অগ্নি স্বরূপ। সে ক্ষুরের ধারালো দিক। এই সমস্তই তার দেহে সন্নিবিষ্ট।"[62]

নারীদের প্রতি ঘৃণাভরে বলা হয়েছে,

Men should not love their

অর্থাৎ "নারীদেরকে ভালোবাসা পুরুষদের উচিৎ নয়।"[63]

---

[62]. আব্দুল খালেক, নারী (ঢাকা : দীনী পাবলিকেশন্স, দ্বিতীয় প্রকাশ : ১৯৯৯), পৃঃ ৪১]

[63]. [সাইয়্যেদ জালালুদ্দীন আনসারী ওমরী, ইসলামী রাষ্ট্রে নারীর অধিকার, অনুবাদ : মাওলানা কারামত আলী নিজামী (ঢাকা : সালাউদ্দীন বইঘর, প্রথম প্রকাশ : ১৯৯৮ ইং), পৃঃ ২২১]

হিন্দুধর্মে মা-বাবার মুক্তির জন্যে পুত্রকে বিশেষ ধর্মীয় রুসুম ও অনুষ্ঠান পালন করতে হয়। নারীকে নয়। তাদের এই রেওয়াজ পালনই একথা প্রমাণ করে নারী হিন্দু ধর্মে কতটা নীচ বলে গণ্য। সন্ন্যাস্য ও বৈরাগ্যকে উৎসাহিত করা হতো। কুমার জীবনকে মনে করা হতো শ্রেষ্ঠ জীবন। পঞ্চাশ বছর বয়সে বিয়ে করাকে মডেল মনে করা হতো। নারী পিতৃ সম্পদের হকদার বিবেচিত হতো না। স্বামীর সম্পদেও না। বিবাহ বিচ্ছেদের কোনো ধারণাই ছিল না। নারী-পুরুষ বলতে মানবজাতির দুটি মূল স্রোত বা শ্রেণি মনে করা হতো না। মনে করা হতো, পুরুষ মালিক আর নারী 'সম্পদ'। তাই বিয়ের পর বিচ্ছিন্ন হওয়ার আর কোনো পথই ছিল না তাদের।

আজও কোনো কোনো হিন্দু চিন্তাবিদ ইসলামের একাধিক বিয়ে প্রসঙ্গে আপত্তি উত্থাপন করেন। অথচ জনাব মালিক রাম এটা প্রমাণ করে দেখিয়েছেন: স্বয়ং হিন্দু ধর্মেই একাধিক বিয়ের অনুমতি আছে। বরং মহাভারতে তো একই সময় দ্রৌপদীর একাধিক স্বামীর কথা উল্লেখ আছে। এটা যে নারীর জন্যে চরম অবমাননা ও লাঞ্ছনাকর সে কথা বলাই বাহুল্য।

সম্ভবত হিন্দুধর্মে সতীর শিক্ষা ছিল না। কিন্তু যেহেতু হিন্দুধর্মে নারীর মর্যাদা জায়গা-জমির মতো-তাই হিন্দু সংস্কৃতিতে 'সতী'র শিক্ষা স্থান পেয়েছে। বিধবা নারীও মৃত স্বামীর সঙ্গে জ্বলন্ত চিতায় আত্মাহুতি দিতে শুরু করেছে। কারণ, তাদের ধর্মে তো সে স্বামীরই সম্পদ। সুতরাং স্বামী যখন চলে যাচ্ছে তখন তারও চলে যাওয়া উচিত।

বৌদ্ধ ধর্মে

বৌদ্ধ ধর্মে নারীকে সকল পাপের জন্য দায়ী করা হতো। এ সম্পর্কে ঐতিহাসিক ওয়েস্টমার্ক বলেন,

Woman are of all the snares which the tempter has spread for man, the most dangerous; in woman are embodied all the powers of infatuation which blinded the mind of the world.

অর্থাৎ "মানুষের জন্য প্রলোভনের যতগুলি ফাঁদ বিস্তার করে রেখেছে, তন্মধ্যে নারীই সর্বাপেক্ষা বিপজ্জনক। নারীর মধ্যে সকল মোহিনী শক্তি অঙ্গীভূত হয়ে আছে, যা সমস্ত বিশ্বের মনকে অন্ধ করে দেয়।"[64]

[64]. [Nazhat Afza and Khurshid Ahmad, The Position of Woman in Islam, Kuwait Islamic Book Publishers, 1982, p. 9-10.]

ইহুদি ধর্মে

ইহুদী ধর্মে নারীর প্রকৃতিকে বলা হয়েছে,
"সতী নারীও যার চেয়ে পাপিষ্ঠ পুরুষও শতগুণে ভালো"
ইহুদি ধর্মের মূল ধর্মগ্রন্থ তাওরাত (Torah)-এর কোনো পরিচিত আয়াত নয়। তবে এর কাছাকাছি একটি বক্তব্য Ben Sira (Sirach/Ecclesiasticus) নামক প্রাচীন ইহুদি-খ্রিস্টান জ্ঞানসাহিত্যে পাওয়া যায়:
"Better is the wickedness of a man than a woman who does good..."
"একজন সৎকর্মশীল নারীর চেয়েও একজন পুরুষের দুষ্টতা উত্তম..." [65]
তারা নারীকে যাবতীয় পাপ ও মন্দের মূল কারণ হিসেবে গণ্য করেছে।

খৃষ্টান ধর্মে

খৃষ্টধর্ম মতে নারীরাই নরকের প্রবেশ দ্বার। সপ্তম শতাব্দীতে কাউন্সিল অব দ্যা ওয়াইজ-এর অধিবেশনে সর্বসম্মতিক্রমে এই সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় 'Woman has no soul' "নারীর কোন আত্মা নেই।"[66]

চীন সভ্যতায়

চীন দেশের নারীদের অবস্থার বিবরণ দিতে গিয়ে জনৈকা চীনা নারী বলেন, "মানব সমাজে নারীদের স্থান সর্বনিম্ন। অদৃষ্টে কি নির্মম পরিহাস! নারী সর্বাপেক্ষা হতভাগ্য প্রাণী। জগতে নারীর মত নিকৃষ্ট আর কিছু নেই।"[67]

গ্রীক সভ্যতায়

প্রাচীন গ্রীকে হাটে-বাজারে নারীর বেচাকেনা হতো। তাছাড়া এই আধুনিককালের সামাজিক 'কাল' যৌতুক প্রথাও সেই গ্রীক সভ্যতারই উপহার। আইনিভাবে একজন পুরুষের একজন স্ত্রী রাখার নিয়ম থাকলেও আইনের বাইরে ছিল সুযোগের মহা উৎসব। যে যেভাবে যতটা চাইতো স্ত্রী রাখতো। আর নারীরও ছিল তালাকের অধিকার। তাই তালাকের হাটও বেশ গরম থাকতো সর্বদা। ইউরোপীয় চরিত্রের ইতিহাসে প্রফেসর লেকি লিখেছেন: গ্রীকের নির্লজ্জতা ও অপকর্ম ছিল এক সময় প্রবাদের মতো। সেখানকার বাইজিরাই এক সময় সমাজের সবচে' আকর্ষণীয় শ্রেণি হিসেবে বিবেচিত হতো। বড় বড় শাসক ও নেতারা পর্যন্ত তাদের জুলফির প্রশংসায় পঞ্চমুখ থাকতো।

---

[65]. [সাহাফিক আরাফাত, নভেম্বর ১৯৯৯ ইং, পৃঃ ৩৫]
[66]. [নারী, পৃঃ ৯]
[67]. [নারী পৃঃ ৫]

বিশ্বখ্যাত গ্রীক দার্শনিক সক্রেটিস বলেন, “Woman is the greatest source of chaos and disruption in the world” নারী জগতে বিশৃঙ্খলা ও ভাঙ্গনের সর্বশ্রেষ্ঠ উৎস।[68]

রোম সভ্যতায়

রোম সভ্যতা গ্রীক সভ্যতারই ফসল। বর্তমান আধুনিক সভ্যতাও সেই ধারারই পতাকাবাহী। রোমান সভ্যতায় নারী বিয়ের পূর্বে স্বীয় পিতার ও বিয়ের পর স্বামীর সম্পদ বলে বিবেচিত হতো। নারীর যৌতুক-সম্পদ সবকিছুর মালিক হতো তার স্বামী। তালাক ছিল নিষিদ্ধ বৃক্ষের মতো। কোনো কোনো ঐতিহাসিক বলেছেন: সুদীর্ঘ পাঁচশ বছরের বেশিকাল পর্যন্ত কেউ তালাকের নামটি পর্যন্ত শোনেনি। ব্যভিচার ছিল সর্বত্র। বাইজিরা ছিল সমাজের কেন্দ্রবিন্দু। এক সময় এই বিশৃঙ্খলা ও উলঙ্গপনার এমন প্রতিক্রিয়া হলো, মানুষ কুমারত্বকে জীবনের সভ্যতা ও শ্রেষ্ঠত্ব জ্ঞান করতে শুরু করল। অনেকে আজীবন কুমার জীবনযাপন করেছে। এও উল্লেখ আছে, 'হাপেশইয়া' নামক এক নারী আজীবন তার স্বামীকে তার সঙ্গে মিলিত হতে দেয়নি!

রোম সভ্যতায় পরিবারের নেতা ও পরিচালক পিতা বা স্বামী নিজের স্ত্রী ও সন্তানদের উপর নিরঙ্কুশ ক্ষমতার অধিকারী ছিল। তারা যখন ইচ্ছে তখনই নারীকে ঘর থেকে বহিষ্কার করে দিতে পারত।[69]

আরব্য জাহেলী যুগে

আরবের জাহেলিযুগে নারীর অধীকার আর সম্মান নিয়ে আমরা আগেই আলোচনা করেছি। তাই সংক্ষেপে এখানে একটু চেষ্টা করছি।

যে পবিত্র ভূমিতে সর্বপ্রথম ইসলামের সূর্য উদিত হয়েছে সেই আরব দেশেই একদা কন্যা সন্তানকে জীবন্ত কবর দেয়া হতো। স্বামী তালাক দিলে স্ত্রী স্বামীর আত্মীয়দের সম্পদরূপে পরিগণিত হতো। নারীরা সম্পদের ওয়ারিশ হতে পারতো না। আউস ইবন ছাবিত মারা যাবার পর তার স্ত্রী ও সন্তানরা জীবিত ছিল। কিন্তু তার চাচা ও ভ্রাতারা তার সমগ্র সম্পদ দখল করে নেয়। আর এই প্রেক্ষিতেই নারীকে ওয়ারিশ ঘোষণা করে কোরআনে 'মিরাস' সম্পর্কিত আয়াত অবতীর্ণ হয়। একাধিক বিয়ে ছিল গৌরবের প্রতীক। স্ত্রী সংখ্যার কোনো সীমানা ছিল না।

---

[68] [নারী, পৃঃ ২]

[69] [ইসলামী রাষ্ট্রে নারীর অধিকার, পৃঃ ১৩]

হযরত গায়লান ইবন সালামা (রা.) যখন ইসলাম গ্রহণ করেন তখন তার স্ত্রী সংখ্যা ছিল দশজন। তাছাড়া স্ত্রীদের মাঝে ইনসাফেরও কোনো বিধান ছিল না। নারীর সম্ভ্রম এমনভাবে ভেঙ্গে পড়েছিল, একই নারীর একই সময় একাধিক স্বামীরও রেওয়াজ হয়ে গিয়েছিল। এই জাতীয় বিয়েকে 'নিকাহে রাহত্ব' বলা হতো। তাছাড়া পুরুষরা পরস্পরে স্ত্রীও বদল করতো। তালাকের কোনো সীমা ছিল না। তাছাড়া স্বামী যতবারই তালাক দিক না কেন স্বামী চাইলে আবার স্ত্রীকে ফিরিয়ে আনার অধিকার রাখতো। আর স্বামী যদি না চায় তাহলে তার হাত থেকে মুক্তির কোনো পথ ছিল না নারীর সামনে।

এই হচ্ছে বিভিন্ন সভ্যতা ও ধর্মে নারীর অবস্থা। এবার তুলনা করার ভাড় না হয় আপনাদের (পাঠক) হাতেই ছেড়ে দিলাম।

এই অধিকার চিরন্তন

সম্পদে নারীর উত্তরাধিকার একটি চিরন্তন বিধান। এই বিধান নড়াবার ক্ষমতা পৃথিবীর কারো নেই। আল্লাহ তায়ালা পরিষ্কার ঘোষণা করেছেন-

لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُوْنَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا

“মা বাবা এবং আত্মীয়-স্বজনের রেখে যাওয়া সম্পত্তিতে পুরুষের অংশ আছে এবং মা বাবা ও আত্মীয়-স্বজনের রেখে যাওয়া সম্পত্তিতে নারীরও অংশ আছে-তা কম হোক বা বেশি-এ এক নির্ধারিত অংশ।”[70]

বলা প্রয়োজন, ইসলামপূর্ব কালে আরব-আজম সবখানেই নারী এবং শিশু ছিল চরম অবহেলিত শ্রেণি। অবিচার অবহেলা ও বঞ্চনা ছিল তাদের নিত্যসঙ্গী। সমাজ জীবনে তাদের কোনো স্বীকৃত অধিকার ছিল না। বিশেষ কোনো অধিকারের স্বীকৃতি থাকলেও সেটা ছুঁয়ে দেখার সুযোগ তাদের হতো না। মানবসভ্যতার পরম বিশ্বস্ত বন্ধু পবিত্র ইসলামই সর্বপ্রথম এই বঞ্চিতদের পাশে দাঁড়িয়েছে। অন্যান্য অধিকারের সঙ্গে পৈতৃক সম্পত্তিতেও তাদের ভাগ নির্দিষ্ট করে দিয়েছে ইসলাম। সে ভাগের কথাই উল্লিখিত হয়েছে উপরের আয়াতটিতে।

পিতার সম্পদে সন্তানের অধিকারটিও ছিল আরবদের কাছে বেশ উপভোগ্য ধরনের। বরং রসিকতাপূর্ণ। সেই রসিকতা দুর্বলের প্রতি সবলের। তাদের এখানে নিয়ম ছিল-ঘোড়া চালাতে পারে এবং শত্রুকে পরাজিত করে সম্পদ লুটে নিতে পারে এমন সন্তানই

---

[70]. সূরা আন নিসা, ৪:৭

পিতার সম্পদের হকদার হবে। নারী ও শিশু কি পারবে এই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে? সুতরাং বাদ। প্রথমতো কন্যা সন্তানের জন্যে পিতার সম্পদে কোনো অধিকারই ছিল না। আর পুত্রদের মধ্যে যারা নাবালক-লড়াই করতে অক্ষম-তারাও বঞ্চিত হতো মৃত বাবার সম্পদ থেকে। অথচ এরাই ছিল সম্পদের বেশি মুহতাজ। আর স্ত্রী মৃত স্বামীর সম্পদের ভাগ পাওয়ার তো কল্পনাই ছিল না তখন।

এই সময়েরই একটি ঘটনা। সা'দ ইবনে রাবী' রা. ছিলেন একজন বড় সাহাবী। ওহুদ যুদ্ধে শাহাদাত বরণ করেন। আরবের রেওয়াজ হিসাবে তার দুই চাচাত ভাই এসে হযরত সা'দ রা.-এর সমুদয় সম্পদ কব্জা করে বসে। তখন হযরত সা'দ রা.-এর স্ত্রী এসে নিবেদন করল-হে রাসূল! সা'দ আপনার সঙ্গে যুদ্ধে গিয়ে শহীদ হয়েছেন। একজন নাবালক ছেলে ও দুই কন্যা রেখে গেছেন। এদের দুই চাচা এসে সা'দ-এর সব সম্পদ দখল করে নিয়েছে। স্ত্রী সন্তানদের কিছুই দেয়নি।

হযরত সা'দ রা.-এর স্ত্রী চেয়েছিল সা'দ-এর দুই চাচাত ভাই যদি এই কন্যা দুইজনকে বিয়ে করে নেয় তবুও রক্ষা। কারণ অর্থবিত্ত ছাড়া মেয়েদের বিয়ে দিবেন কি করে!

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার অভিযোগ শোনলেন। বঞ্চনার নির্মম কাহিনি শোনে নীরব রইলেন। মুখে কিছু বললেন না। মনে মনে আশায় রইলেন-এই অবিচারের বিরুদ্ধে নিশ্চয় আল্লাহ তায়ালা কোনো বিধান দিবেন। আর তখনই পিতৃসম্পদ সম্পর্কিত এই আয়াত অবতীর্ণ হয়। হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত সা'দ রা.-এর চাচাত ভাইদের ডেকে পাঠান। বলেন-এদের সম্পদ ফিরিয়ে দাও। অতঃপর তিনি রেখে যাওয়া সম্পদের এক অষ্টমাংশ স্ত্রীকে, অবশিষ্ট সম্পদের অর্ধেক ছেলেকে আর অবশিষ্ট অর্ধেক দুই কন্যাকে ভাগ করে দেন।[71]

লক্ষ করার বিষয় হলো, সম্পদের উত্তরাধিকার বর্ণনা করতে গিয়ে কুর'আনে বলতে পারতো-'পুরুষ ও নারীর জন্যে অংশ রয়েছে...।'

তা না বলে-পুরুষের উত্তরাধিকারের কথা বলেছে স্বতন্ত্রভাবে এবং নারীর উত্তরাধিকারের কথা বলেছে স্বতন্ত্রভাবে। উদ্দেশ্য, যেন কেউ নারীর অধিকারকে পুরুষের অধিকারের অধীন মনে না করে। এবং বাক্যের শেষে বলা হয়েছে-'এ এক নির্ধারিত অংশ।' অর্থাৎ কোনোমতে দিয়ে পার পাওয়ার বিষয় নয়। এখানে নারী ও

[71]. রুহুল মাআনীর সূত্রে-মাআরিফুল কুরআন: মুফতী মুহাম্মদ শফী রহ. : ২: ২১০

পুরুষের অংশ নির্ধারিত। প্রত্যেককেই তার জন্যে নির্ধারিত অংশ তাকে দিতেই হবে। না দিলে সেটা হবে চরম অবিচার এবং আল্লাহর বিধানের জঘন্য লংঘন।

মুসলিম নারী: উম্মাহর প্রাণ

ইসলামের ইতিহাস, সভ্যতা ও উম্মাহর বিকাশের ধারাকে গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করলে দেখা যায় যে, একজন নারীর ভূমিকা কেবল পরিবার পরিচালনার মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়; বরং একটি জাতির চরিত্র গঠন, ভবিষ্যৎ নেতৃত্বের প্রস্তুতি এবং দ্বীনের ধারাবাহিকতা রক্ষার ক্ষেত্রেও তিনি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন।

কুরআনে আল্লাহ তাআলা হযরত মূসা (আ.)-এর ঘটনা বর্ণনা করতে গিয়ে তাঁর মায়ের ত্যাগ, ধৈর্য, ঈমান ও আল্লাহর উপর নির্ভরতার কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করেছেন। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাআ'লা বলেন,

وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ ۖ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي ۖ إِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ

অর্থ: “আর আমি মূসার মায়ের প্রতি নির্দেশ পাঠালাম যে, তাকে দুধ পান করাও। অতঃপর যখন তার ব্যাপারে আশঙ্কা করবে, তখন তাকে নদীতে নিক্ষেপ করে দিও। আর ভয় করো না এবং দুঃখ করো না। নিশ্চয়ই আমি তাকে তোমার কাছে ফিরিয়ে দেব এবং তাকে রাসূলদের অন্তর্ভুক্ত করব।”[72]

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতাআ'লা আরোও বলেন,

وَنُرِيدُ أَنْ نَمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ

“আর আমি ইচ্ছা করলাম, পৃথিবীতে যারা দুর্বল ও নির্যাতিত ছিল তাদের প্রতি অনুগ্রহ করতে, তাদেরকে নেতা (ইমাম) বানাতে এবং তাদেরকে উত্তরাধিকারী করতে।”[73]

এ আয়াতে আল্লাহ তাআলা নির্যাতিত জাতিকে নেতৃত্ব ও বিজয় দানের ঘোষণা দিয়েছেন, আর ৭ নং আয়াতে দেখা যায় সেই পরিবর্তনের সূচনা হয়েছে একজন মায়ের (মূসা আ.-এর মা) ঈমান, ধৈর্য ও আল্লাহর উপর ভরসার মাধ্যমে।

এটি কেবল একটি ঐতিহাসিক ঘটনা নয়; বরং এর মাধ্যমে আল্লাহ তাআলা বুঝিয়ে দিয়েছেন যে, একটি জাতির পরিবর্তন ও পুনর্জাগরণের সূচনা অনেক সময় একজন মুমিন নারীর হাত ধরেই হতে পারে। ইতিহাস সাক্ষ্য দেয়, মহান ব্যক্তিত্ব, আলিম,

---

72. সূরা আল- কসাস, ২৮:৭

73. সূরা কসাস, ২৮:৫

মুজাহিদ ও সংস্কারকদের পেছনে এমন নারীদের অবদান রয়েছে, যারা সন্তানদের ঈমান, চরিত্র ও আদর্শ গঠনে নিরলস শ্রম দিয়েছেন।

মুসলিম সমাজে নারী কেবল একজন স্ত্রী বা মা নন; তিনি একটি প্রজন্মের নির্মাতা। একজন সৎ, শিক্ষিত ও দ্বীনদার নারী তার পরিবারকে ইসলামের আলোয় পরিচালিত করেন, সন্তানদের নৈতিক শিক্ষা দেন এবং সমাজের জন্য আদর্শ মানুষ গড়ে তোলেন। এ কারণেই বলা হয়, একজন পুরুষকে শিক্ষিত করলে একজন ব্যক্তি শিক্ষিত হয়, কিন্তু একজন নারীকে শিক্ষিত করলে একটি পরিবার শিক্ষিত হয়। উম্মাহর শক্তি, স্থিতিশীলতা ও ভবিষ্যৎ অনেকাংশে নির্ভর করে তার নারীদের ঈমান, জ্ঞান, চরিত্র ও দায়িত্ববোধের উপর।

দুঃখজনক হলেও সত্য যে, মুসলিম সমাজের কিছু অঞ্চলে দীর্ঘদিন ধরে প্রচলিত কুসংস্কার, সামাজিক বৈষম্য ও জাহিলি প্রথার কারণে নারীরা তাদের অনেক শরিয়তসম্মত অধিকার থেকে বঞ্চিত হয়েছে। শিক্ষা থেকে বঞ্চিত করা, উত্তরাধিকার সম্পত্তি না দেওয়া, নারীর মতামতকে গুরুত্ব না দেওয়া কিংবা তাকে কেবল গৃহবন্দি এক সত্তা হিসেবে উপস্থাপন করা ইসলামের শিক্ষা নয়; বরং এগুলো সামাজিক বিচ্যুতি। ইসলামের নির্দেশনা থেকে দূরে সরে যাওয়ার ফলে যখন নারীরা অবহেলা ও বঞ্চনার শিকার হয়েছে, তখন পাশ্চাত্য চিন্তাধারা ও লিবারেল মতবাদ সেই শূন্যতার সুযোগ গ্রহণ করেছে। তারা নারী মুক্তির নামে এমন এক জীবনব্যবস্থা প্রচার করেছে, যেখানে নারীর প্রকৃত মর্যাদা ও স্বকীয়তার পরিবর্তে তাকে ভোগবাদী সংস্কৃতি ও অর্থনৈতিক প্রতিযোগিতার উপকরণে পরিণত করা হয়েছে।

অপরদিকে ইসলাম নারীকে তার স্বাভাবিক মর্যাদা, সম্মান ও নিরাপত্তা প্রদান করেছে। ইসলাম নারীর শিক্ষা, সম্পত্তি, উত্তরাধিকার, বিবাহ, মতামত প্রদান এবং সামাজিক অংশগ্রহণের অধিকার নিশ্চিত করেছে। একই সঙ্গে তাকে পরিবার ও সমাজে সম্মানজনক অবস্থান দিয়েছে। ইসলামের দৃষ্টিতে নারী কোনো বোঝা নয়, কোনো প্রতিযোগীও নয়; বরং তিনি একজন সম্মানিত মানুষ, যিনি পরিবার ও সমাজের কল্যাণে গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করেন। তাই মুসলিম সমাজের কর্তব্য হলো নারীদের শরিয়তপ্রদত্ত অধিকার নিশ্চিত করা, তাদের যথাযথ শিক্ষা ও নৈতিক বিকাশের সুযোগ সৃষ্টি করা এবং সামাজিক কুসংস্কার ও পাশ্চাত্য ভোগবাদী চিন্তাধারা উভয় থেকে তাদেরকে রক্ষা করা।

নারীই উম্মাহর শক্তি। নারীর স্বল্পতাই উম্মার পরাজয়। নারীদের প্রতি উম্মাহর গভীর মনোযোগ দিতে হবে, তাদের খেয়াল রাখতে হবে। পশ্চিমা শয়তানরা পর্দানশীল নারীর আবস্থান ও পর্দা নিয়ে উঠে পড়ে লেগেছে। মুসলিম উম্মাহর নারীদের তারা শেষ করে দিতে চায়। বর্তমানে ফান্সের দিকে তাকালেই তাদের চক্রান্ত বোঝা সম্ভব। ফ্রান্সে এতো এতো সমস্যা থাকতে তারা হিজাবের পিছনে লেগেছে। সরকারি বিদ্যালয়ে প্রকাশ্য ধর্মীয় প্রতীক হিসেবে হিজাব কে নিষিদ্ধ করেছে। পশ্চিমারা কোটি কোটি টাকা খরচ করছে কিভাবে পরিবার প্রথা ভেঙ্গে দেওয়া যায়, মুসলিম নারীকে 'উদার' বানিয়ে প্রদর্শনীর বস্তু বানানো যায়, কিভাবে তাদের ঈমান কেড়ে নেয়া যায়।

বর্তমান বিশ্বে পরিবারব্যবস্থার সংকট, নৈতিক অবক্ষয় এবং সামাজিক অস্থিরতার প্রেক্ষাপটে মুসলিম নারীদের ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। একজন সচেতন, দ্বীনদার ও আদর্শ নারী একটি পরিবারকে রক্ষা করতে পারেন, একটি প্রজন্মকে গড়ে তুলতে পারেন এবং একটি জাতির পুনর্জাগরণের ভিত্তি স্থাপন করতে পারেন। এ কারণেই মুসলিম নারীদেরকে উম্মাহর প্রাণশক্তি বলা হয়। তাদের ঈমান, ধৈর্য, ত্যাগ, ভালোবাসা ও আত্মনিবেদন ছাড়া একটি সুস্থ পরিবার, একটি আদর্শ সমাজ এবং একটি শক্তিশালী উম্মাহ কল্পনা করা যায় না। সুতরাং উম্মাহর অগ্রগতি, স্থিতিশীলতা ও ভবিষ্যৎ সাফল্যের জন্য নারীদের মর্যাদা, অধিকার ও ইসলামী পরিচয় সংরক্ষণ করা, তাদের খেয়াল রাখা এখন সময়ের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ দাবি।

তুলনামূলক বিশ্লেষণ

উপরের উপর্যুক্ত আলোচনা থেকে প্রমান হয় যে, নারী অধিকার ও নারীর মর্যাদা বিষয়ে ইসলাম এবং আধুনিক নারীবাদ সম্পূর্ণ ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি উপস্থাপন করে। নারীবাদ মূলত ব্যক্তি স্বাধীনতা, সমতা এবং অর্থনৈতিক স্বাবলম্বিতাকে নারীর মুক্তির প্রধান উপায় হিসেবে বিবেচনা করে। অন্যদিকে ইসলাম নারীকে কেবল অর্থনৈতিক বা সামাজিক সত্তা হিসেবে নয়; বরং একজন পূর্ণাঙ্গ মানুষ, মা, কন্যা, স্ত্রী এবং সমাজের গুরুত্বপূর্ণ সদস্য হিসেবে মূল্যায়ন করে। ইসলামের দৃষ্টিতে নারীর মর্যাদা তার অর্থনৈতিক সক্ষমতা বা বাহ্যিক সাফল্যের উপর নির্ভরশীল নয়; বরং তার তাকওয়া, চরিত্র, দায়িত্ববোধ এবং আল্লাহর আনুগত্যের উপর নির্ভরশীল।

এই গবেষণার আলোচনায় দেখা যায়, ইসলাম নারীকে এমন সময় উত্তরাধিকার, সম্পত্তির মালিকানা, শিক্ষা, বিবাহে সম্মতি, মহর এবং সামাজিক মর্যাদার অধিকার প্রদান করেছিল, যখন পৃথিবীর বহু সমাজে নারী মৌলিক মানবিক অধিকার থেকেও বঞ্চিত ছিল। অন্যদিকে আধুনিক যুগে নারীবাদ নারীর বিভিন্ন অধিকার নিয়ে সচেতনতা সৃষ্টিতে ভূমিকা রাখলেও এর ধারা পরিবারব্যবস্থা, মাতৃত্ব, বৈবাহিক বন্ধন এবং নারী-পুরুষের স্বাভাবিক পার্থক্যকে প্রশ্নবিদ্ধ করেছে। যার ফলে অনেক ক্ষেত্রে নারী-পুরুষের পারস্পরিক সহযোগিতার সম্পর্ক প্রতিযোগিতামূলক সম্পর্কে রূপান্তরিত হতে দেখা যায়।

ইসলাম নারী ও পুরুষকে একে অপরের প্রতিদ্বন্দ্বী নয়, বরং পরস্পরের পরিপূরক হিসেবে বিবেচনা করে। আল্লাহ তাআলা উভয়কে ভিন্ন ভিন্ন দায়িত্ব, সামর্থ্য ও বৈশিষ্ট্য দান করেছেন এবং সেই অনুযায়ী তাদের অধিকার ও কর্তব্য নির্ধারণ করেছেন। তাই ইসলামী দৃষ্টিকোণ থেকে ন্যায়বিচার মানে সকল ক্ষেত্রে অভিন্নতা নয়; বরং প্রত্যেককে তার উপযোগী অধিকার ও দায়িত্ব প্রদান করা। এ কারণেই ইসলাম নারী ও পুরুষের মধ্যে মর্যাদাগত সমতা স্বীকার করলেও সবক্ষেত্রে অভিন্ন দায়িত্ব ও ভূমিকার ধারণা সমর্থন করে না।

অতএব, তুলনামূলক পর্যালোচনায় বলা যায় যে, নারীর প্রকৃত কল্যাণ, নিরাপত্তা, সম্মান এবং মানবিক মর্যাদা নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে ইসলাম একটি ভারসাম্যপূর্ণ ও পূর্ণাঙ্গ জীবনব্যবস্থা উপস্থাপন করে। একই সঙ্গে মুসলিম সমাজের দায়িত্ব হলো ইসলামের প্রদত্ত নারীর অধিকারসমূহ যথাযথভাবে বাস্তবায়ন করা এবং সমাজে প্রচলিত অন্যায়, কুসংস্কার ও বৈষম্য দূর করা। কারণ ইসলামের আদর্শ ও বাস্তব মুসলিম সমাজের চর্চার মধ্যে পার্থক্য থাকলে তার দায় ইসলামের নয়; বরং মুসলমানদের আমল ও বাস্তবায়নের ঘাটতির।

এই আলোচনার ভিত্তিতে বলতে চাই, নারীর মর্যাদা ও অধিকার প্রতিষ্ঠার প্রশ্নে ইসলামের মূলনীতি, কুরআন-সুন্নাহর নির্দেশনা এবং বাস্তব প্রয়োগের মধ্যে সমন্বয় প্রতিষ্ঠাই একটি সুস্থ, ন্যায়ভিত্তিক ও ভারসাম্যপূর্ণ সমাজ গঠনের অন্যতম পূর্বশর্ত।

মুক্তির পথ

নারীবাদীদের থেকে মুক্তি পেতে আমাদের করণীয়:

মূলত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগ থেকেই ইহুদি, খ্রিষ্টান ও মুশরিকরা ইসলাম ও মুসলিমদের সাথে শত্রুতা পোষণ করে আসছে। মুসলিমদের কে তাদের মতো কাফের বানানোর জন্য তাদের এই শত্রুতা কেয়ামত পর্যন্ত বহাল থাকবে। এটি আল্লাহর কুর'আনের সুস্পষ্ট বাণী। মহান আল্লাহ তা'আলা বলেন,

وَلَنْ تَرْضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قُلْ إن هذى اللَّهِ هُوَ الْهُدَى وَلَبِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ العِلم ما لك مِنَ اللَّهِ مِنْ ولي ولا نصير

"ইহুদি ও নাসারা তোমার প্রতি কিছুতেই খুশি হবে না, যতক্ষণ না তুমি তাদের ধর্মের অনুসরণ করবে। বলে দাও, প্রকৃত হিদায়াত তো আল্লাহরই হিদায়াত। তোমার কাছে (ওহির মাধ্যমে) যে জ্ঞান এসেছে, তারপরও যদি তুমি তাদের খেয়াল-খুশির অনুসরণ করো, তবে আল্লাহর থেকে রক্ষা করার জন্য তোমার কোনো অভিভাবক থাকবে না এবং সাহায্যকারীও না।"[74]

আমরা যদি আধুনিক ইতিহাসের প্রতি লক্ষ করি তাহলে দেখতে পাব, কীভাবে পশ্চিমা বিশ্ব বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান ও বিধি-নিয়মের মাধ্যমে মুসলিম বিশ্বে রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও আদর্শিক প্রভাব বিস্তার করে রেখেছে। এগুলো কোন ষড়যন্ত্রতত্ত্ব নয়; বরং ওপেন সিক্রেট। স্বয়ং পশ্চিমারাও এই বিষয়গুলে অস্বীকার করবে না।

মুসলিমদের বিরুদ্ধে এদের যড়যন্ত্র নতুন কিছু নয়; বরং পবিত্র কুর'আনেও আমরা এর উপস্থিতি দেখতে পাই। মহান আল্লাহ তা'আলা বলেছেন,

وَجَاءَ رَجُلٌ مِنْ أقصى المدينة يسعى قال يا مُوسَى إِنَّ المَلا يَأْتَمِرُونَ بِكَ يَقْتُلُوكَ فَاخْرُجْ إِنِّي لك من الناصحين.

"(তারপরের বৃত্তান্ত এই যে) নগরের বিলকুল দূর প্রান্ত হতে এক ব্যক্তি ছুটে আসল ও বলল, হে মুসা। নেতৃবর্গ তোমাকে হত্যা করার জন্য পরামর্শ করছে। সুতরাং তুমি এখান থেকে বের হয়ে যাও। বিশ্বাস করো, আমি তোমার কল্যাণকামীদের একজন।"[75]

---

74. সূরা আল-বাকারাহ্, ২:১২০

75. সূরা কসাস, ২৮:২০

কিন্তু বর্তমান সময়ে সেকুলার, লিবারেল ও মডার্নিস্টদের অনেকে ষড়যন্ত্রের ব্যাপারে উপহাসের অবস্থান গ্রহণ করেছে। তারা এই বলে তিরস্কার করে যে, মুসলিমরা সবকিছুতেই ষড়যন্ত্র খোঁজে। এতে কোনো সন্দেহ নেই যে, কিছু লোক ষড়যন্ত্র নিয়ে খুব বাড়াবাড়ি করে। কিন্তু ষড়যন্ত্রের বিষয়টিকে একেবারেই না করে দেওয়া বাস্তবতাকে অস্বীকার করা ছাড়া কিছুই না। যারা ষড়যন্ত্রকে অস্বীকার করে, দেখা যাবে তাদের অধিকাংশই হয়তো পশ্চিমাদের এজেন্ট ও তাদের এজেন্ডা বাস্তবায়নকারী কিংবা তারা পশ্চিমা সভ্যতা ও সংস্কৃতির প্রতি মুগ্ধ ও অনুরাগী। ব্যতিক্রম কিছু ছাড়া সবাইকে আপনি এই ক্যাটাগরিতে খুঁজে পাবেন।

ষড়যন্ত্রতত্ত্ব নিয়ে সবচেয়ে ভারসাম্যপূর্ণ বক্তব্য হলো, সাধারণভাবে ষড়যন্ত্রকে অস্বীকার করা ষড়যন্ত্রের অংশ। আর ষড়যন্ত্র নিয়ে বাড়াবাড়ি করা হলো যড়যন্ত্রে সহায়তা করা। এজন্য যারা ষড়যন্ত্রতত্ত্ব দিয়ে মুসলিমদের নিয়ে উপহাস করে তাদের অধিকাংশ নিজেরাই এই ষড়যন্ত্রের অংশ হোক তা জেনে কিংবা না জেনে, বুঝে কিংবা না বুঝে। আর র‍্যান্ড কর্পোরেশনের রিপোর্টগুলো থেকে এই বাস্তবত আরও সুস্পষ্ট হয়ে যায় আমাদের সামনে। আর যারা ষড়যন্ত্র নিয়ে বাড়াবাড়ি করতে গিয়ে শত্রুদের ব্যাপারে মুমিনদের অন্তরে ভয় সৃষ্টি করে এবং সেই ষড়যন্ত্রগুলোকে অজেয় ও অধরা বানিয়ে মুসলিমদের সামনে উপস্থাপন করে, তারা হলো ষড়যন্ত্রের সহায়তাকারী (বুঝে কিংবা না বুঝে)।

আমরা বিশ্বাস করি, কাফেররা প্রতিনিয়ত আমাদের বিরুদ্ধে চক্রান্ত করে যাচ্ছে। কিন্তু আল্লাহ হলেন সেসব চক্রান্তের উত্তম প্রত্যুত্তরদাতা। ফলে তাদের যড়যন্ত্র হলো মাকড়সার জালের মতো দুর্বল। আমাদের দায়িত্ব হলো, সচেতনতার সাথে সেগুলোর মোকাবিলা করে যাওয়া। আল্লাহ তা'আলাই তাদের সকল পরিকল্পনাকে নস্যাৎ করে দেবেন। সেই দৃষ্টিকোণ থেকে আমরা এখানে মুসলিম-সমাজ, বিশেষত মুসলিম নারীদের জন্য করণীয় কিছু বিষয় তুলে ধরব ইন শা আল্লাহ:-

১. বিকৃত নারীবাদী আন্দোলন ও ইসলামি শরিয়াহবিরোধী নারী-অধিকারের দাবি উত্তোলনকারী প্রত্যেক প্রচেষ্টা, স্লোগান ও সংস্থার বিরুদ্ধে আমর বিল মারুফ ও নাহি আনিল মুনকারের অত্যাবশ্যকীয় দায়িত্ব পালন করা।

২. কর্মের প্রতি মুখাপেক্ষী নারীদের জন্য শরিয়াহবান্ধব পরিবেশ ও সেক্টরের ব্যবস্থা এবং তার দাবিকে জোরদার করা। পাশাপাশি এমন বোনদের বৈধ সেক্টরগুলোর প্রতি

আগ্রহী করে তোলা এবং ইসলামি শরিয়াহ কর্তৃক নিষিদ্ধ সেক্টরগুলো থেকে বিমুখ করে তোলা।

৩. নারী সংশ্লিষ্ট বিষয়গুলো নিয়ে ইসলামি দৃষ্টিকোণ থেকে অনলাইন ও অফলাইনভিত্তিক তৎপরতা বৃদ্ধি করা এবং এই ক্ষেত্রে দুটি পর্যায়ে কাজ করা। প্রথমত, ইসলামি শরিয়াহর প্রতি নারীর সম্মান ও গর্বকে ইতিবাচকভাবে বৃদ্ধি করা। দ্বিতীয়ত, নারীবিষয়ক সেকুলার, লিবারেল ও ফেমিনিস্ট দৃষ্টিভঙ্গিগুলোর অসারতা ও ভ্রান্তিকে সুস্পষ্ট করা।

৪. মুসলিম নারীদের মধ্য থেকে উল্লেখযোগ্য কিছু বোনদের তৎপর হওয়া উচিত, যারা আদর্শ ও ইলমি যোগ্যতায় উত্তীর্ণ। এ সমস্ত বোনরা মুসলিম তরুণীদের মাঝে ইসলামি শরিয়াহর বিধানগুলো আপসহীনভাবে হৃদয়ঙ্গম করে বোনদের সামনে তুলে ধরবেন। তারা প্রভাব বিস্তারকারী হবেন, প্রভাবিত হবেন না। তাদের বক্তব্য হবে সুস্পষ্ট, যেখানে থাকবে না পশ্চিমা সংস্কৃতির কাছে নতি স্বীকার। এর জন্য তারা সামাজিক যোগাযোগ-মাধ্যমসহ বিভিন্ন প্লাটফর্ম ব্যবহার করাবেন। নারীদের জন্য বিশেষ একাডেমী প্রতিষ্ঠা করে তার আওতায় নারী সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন বিষয়ে কোর্স ও কর্মশালার আয়োজন করবেন।

৫. বিদ্যমান সমাজে নারীরা যেসব অন্যায় ও জুলুমমূলক আচরণের শিকার হং তার বিরুদ্ধে সচেতনতা গড়ে তোলা এবং ইসলামি শরিয়াহর বিরুদ্ধে না গিয়ে বরং ইসলামি শরিয়াহর আলোকেই তার সমাধান বাস্তবসম্মতভাবে পেশ করা। বিশেষত নির্দিষ্টভাবে যেসব নারী এমন পরিস্থিতির শিকার, কল্যাণ ও সংশোধনের মানসিকতা নিয়ে তাদের পাশে দাঁড়ানো এবং তাদের প্রতি হওয়া জুলুমকে নির্মূলে করে তাদের জন্য ইনসাফ নিশ্চিত করা।

৬. নারীদের অন্তরে আকিদাকে গেঁথে দেওয়া।

৭. দলবদ্ধভাবে কিংবা সংস্থারূপে আন্তর্জাতিক সংগঠনগুলোর ইসলামবিরোধ স্বার্থসমূহের বিরুদ্ধে দাঁড়ানো এবং মুসলিম বিশ্বের ভেতরগত বিষয়ে সেসব সংস্থার অনুপ্রবেশকে না বলা।

৮. মুসলিম তরুণীদের হায়া, তহারাত ও পর্দার ওপর প্রতিপালন করা। নারীত্ব ও মাতৃত্ব বিষয়ে ইলমি ও তরবিয়তি তৎপরতা বৃদ্ধি করা, যার মাধ্যমে নারী ও মাতৃত্বে তার ইবাদাত ও স্বভাবজাত দিকগুলো ফুটে উঠবে। বিশেষত মুসলিম নারীদের মাঝে আল্লাহ ও তাঁর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ভালোবাসা ও আনুগত্যকে গভীর করে তোলা।

৯. প্রাথমিক, মাধ্যমিক ও বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে নারী সংশ্লিষ্ট বিষয়ে বিশেষ প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা করা।

১০. মুসলিম নারীদের জন্য জরুরি হলো, উপনিবেশবাদী ও প্রাচ্যবাদী সংস্থাগুলে তাদের ওয়েস্টার্নাইজেশন তথা পশ্চিমায়নের জন্য যত চক্রান্ত আবিষ্কার করেছে সেগুলো ভালোভাবে চিনে নেওয়া এবং তাদের এই উদ্দেশ্য বাস্তবায়ন করতে না দেওয়া।

১১. জন্মনিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলোর যেই অসৎ উদেশ্য, সেটাকে অনুধাবন করা। মুসলিম উম্মাহর জনশক্তি বৃদ্ধির ক্ষেত্রে তাদের হুমকি ধমকিতে প্রতারিত না হয়ে, বরং আল্লাহর রাসুলের গর্বের ব্যবস্থা করা। নিজের সন্তানদের সৎ ও সাহসী মুসলিম হিসেবে গড়ে তোলার জন্য সর্বোচ্চ চেষ্টা করা এবং সেজন্য বিশেষ শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ গ্রহণ করা।

১২. নারীবাদী আন্দোলনগুলোর সাথে সংশ্লিষ্ট সংস্থা ও প্রতিষ্ঠানগুলোর ব্যাপারে জানা এবং এগুলোর ব্যাপারে সচেতনতা গড়ে তোলা।

১৩. নারীদের নিয়ে প্রাচ্যবাদী গবেষণাসমূহের বিরুদ্ধে মুসলিমদের গবেষণা ও পর্যালোচনা তৈরি করা এবং সেগুলো মুসলিম নারীদের ভেতর ছড়িয়ে দেওয়া।

১৪. মুসলিম দেশগুলোতে কেবল নারীদের জন্য বিভিন্ন সংস্থা, ইন্সটিটিউট ও বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করা। যারা মুসলিম নারীদের পশ্চিমায়নের হাত থেকে বাঁচাতে বুদ্ধিবৃত্তিক ও ইলমি প্রাচীর তৈরি করবে। পশ্চিমা সংস্কৃতিতে প্রভাবিত মুসলিম বোনদের নীড়ে ফেরানোর জন্য পলিসি প্রস্তুত করবে এবং আধুনিক নারীবাদী সংস্থাগুলোর বিরুদ্ধে নারীদের ভেতর জাগরণ সৃষ্টি করবে।

১৫. প্রত্যেক নারীকে তার সামাজিক দায়িত্ব পালনের যোগ্য করে তোলা। যাতে সে পরিবার গঠনে এবং পরিবারের ও সন্তানদের লালনপালনে উত্তম অবদান রাখতে পারে। পাশাপাশি তাদের সমাজের নৈতিক ও সামাজিক সংস্কারের কাজের যোগ্য করে তুলতে হবে। কেননা আমাদের পরিবারগুলোকে, মায়েদের ও নারীদের তাদের প্রকৃত দায়িত্ব সুষ্ঠুভাবে পালনের পন্থা শিক্ষা দেওয়া অত্যন্ত জরুরি। আর এই মহান সংস্কারমূলক কাজে পুরুষদের চেয়ে নারীরাই অধিকতর উপযোগী ও সক্ষম।

১৬. বিশেষভাবে সমাজের পুরুষদের একটি দায়িত্ব হলো, নারীর পারিবারিক মর্যাদা নিশ্চিত করা। নারীকে পশ্চিমা ভোগবাদী দর্শনের মতো নিছক উৎপাদক যন্ত্র হিসেবে না দেখা। বর্তমান সময়ে নারীদের পরিবার থেকে বের করার অনেকগুলো কারণের মধ্যে একটি হলো, পরিবারে তার অবদান খাটো করা। অর্থনৈতিকভাবে কিংবা

উপার্জনের দিক থেকে তার অবদানকে মূল্যায়ন না করা। পুরুষদের এই জঘন্য মানসিকতা থেকে বেরিয়ে আসতে হবে। নারীর অর্থনৈতিক দায়িত্ব নেওয়া পুরুষকর্তৃক নারীর ওপর কোনো প্রকার অনুগ্রহ নয়; বরং এটা তার আবশ্যিক দায়িত্ব। যা মহান আল্লাহ তা'আলা তার ওপর ধার্য করেছেন।

বড় দুঃখজনক ব্যাপার হলো, প্রকৃতি নারীকে সর্বাধিক মূল্যবান যে জিনিসট দিয়েছে সেটাই সে হারাতে বসেছে। সে জিনিসটি হচ্ছে তার নারীত্ব। এটা হারিয়ে সে সমস্ত সুখ-শান্তিও হারাচ্ছে। পরিবার হচ্ছে নারী-পুরুষ উভয়ের স্বাভাবিক সুখের নীড়। মাতা ও গৃহিণীর তদারকি ছাড়া এই সুখের নীড় টিকে থাকতে পারে না। পরিবারই সমাজের ও ব্যক্তির সুখের উৎস। পরিবারই কল্যাণ, মেধাও প্রজ্ঞার সুতিকাগার।

আমাদের দুটো দর্শনের মধ্য থেকে যেকোনো একটাকে বেছে নিতে হবে। একদিকে রয়েছে ইসলামের দর্শন, যা নারীর মর্যাদা ও সম্ভ্রমের উৎকৃষ্টতম রক্ষক এবং যা তাকে স্ত্রী ও মা হিসেবে তার সামাজিক দায়িত্ব একাগ্রভাবে পালন করার সুযোগ দেয়। আর এরই বিনিময়ে সমাজকে তার অর্থনৈতিক প্রয়োজন পূরণে ও তার সার্বিক নিরাপত্তা বিধানে বাধ্য করে। এজন্য ইসলাম স্বামীর ওপর কিংবা স্ত্রীর আত্মীয়স্বজনের ওপর স্ত্রীর ও তার সন্তানদের ভরণপোষণের ভার অর্পণ করে। এতে নারীর অবমাননা কিংবা অবমূল্যায়নের প্রশ্নই ওঠে না। কেননা নারী সেই সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক দায়িত্বটা পালন করে, যা মানব জাতির সুখ-শাড়ি ও উন্নয়নের একমাত্র রক্ষাকবচ।

অন্যদিকে আছে পাশ্চাত্য সভ্যতার বস্তুবাদী ও ভোগবাদী দর্শন। এই দর্শন নারীর জৈবিক দাবির ব্যাপারে তার ওপর কঠোর নিষ্পেষণ, নিপীড়ন চালায়। স্ত্রী ও মা হিসেবে তার স্বাভাবিক দায়িত্ব পালনের পাশাপাশি তার নিজের জীবিকাগ্রচি নিশ্চিত করতে কঠোর পরিশ্রমে তাকে বাধ্য করে। তার নারীত্ব নষ্ট করে তাকে পা কিংবা যন্ত্রে রূপান্তর করে। এভাবে নারী নিজেও ক্ষতিগ্রস্ত হয়, তার সন্তানরাও ক্ষতিগ্রস্ত হয় এবং সামগ্রিকভাবে সমাজে পারিবারিক জীবনের স্থিতিশীলতা, সংহতি ও বন্ধন নিদারুণভাবে ব্যাহত হয়।

আমরা যারা মুসলিম, তাদের পক্ষে তো ইসলাম ও তার জীবন বিধানের চেয়ে অন্য কিছুকে অধিকতর কল্যাণকর মনে করা সম্ভবই না। কারণ মহান আল্লাহ তাআলা বলেছেন, 'ওরা কি তবে জাহিলিয়াতের বিধিবিধান চায়? মুমিনদের জন্য আল্লাহর চেয়ে উত্তম বিধানদাতা আর কে হতে পারে!

শত্রুরা আমাদের ওপর যেই কৌশল বারবার অবলম্বন করে সফল হতে চাচ্ছে, আমাদের উচিত নয় তার মাধ্যমে প্রতারিত হওয়া। রাসুলুল্লাহ ﷺ বলেছেন,
"মুমিন একই গর্ত থেকে দু'বার দংশিত হয় না।"[76]
আল্লামা ইবনে হাজার আসকালানী (রহ.) এ হাদিসের ব্যাখ্যায় বলেন, একজন মুমিনের উচিত পূর্ব অভিজ্ঞতা থেকে শিক্ষা গ্রহণ করা এবং একই ভুল বা প্রতারণার পুনরাবৃত্তি না করা। এটাতে মুমিনের বিচক্ষণতা ও দূরদর্শিতার মেধা ব্যবহার করার নির্দেশনা আছে।

মহান আল্লাহ তাআলা বলেছেন,
هُوَ الَّذِي أَخْرَجَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مِنْ دِيَارِهِمْ لِأَوَّلِ الْحَشْرِ مَا ظَنَنْتُمْ أَنْ يَخْرُجُوا وَظَنُّوا أَنَّهُمْ مَا نِعَتُهُمْ حُصُونُهُمْ مِنَ اللهِ فَأَتَاهُمُ اللهُ مِنْ حَيْثُ لَمْ يَحْتَسِبُوا وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ يُخْرِبُونَ بُيُوتَهُمْ بِأَيْدِيهِمْ وَأَيْدِي الْمُؤْمِنِينَ فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ.
"আর তিনিই কিতাবিদের মধ্যে যারা কাফের, তাদের প্রথম সমাবেশেই তাদের ঘর-বাড়ি থেকে উচ্ছেদ করেছেন। (হে মুসলিমগণ।) তোমরা কল্পনাও করোনি তারা বের হয়ে যাবে। তারাও মনে করেছিল, তাদের দুর্গগুলি তাদের আল্লাহ হতে রক্ষা করবে। অতঃপর আল্লাহ তাদের কাছে এমন দিক থেকে আসলেন, যা তারা ধারণাও করতে পারেনি। আল্লাহ তাদের অন্তরে ভীতিসঞ্চার করলেন। ফলে তারা নিজেদের হাতে নিজেদের ঘর-বাড়ি ধ্বংস করে ফেলেছিল এবং মুসলিমদের হাতেও। সুতরাং হে চক্ষুষ্মানেরা, তোমরা শিক্ষা গ্রহণ করো!"[77]
এই আয়াতে আল্লাহ তা'আলা অতীত জাতির পরিণতি থেকে শিক্ষা গ্রহণের নির্দেশ দিয়েছেন। ইতিহাসের ঘটনাবলি কেবল বর্ণনার জন্য নয়; বরং ভবিষ্যৎ পথচলার জন্য সতর্কবার্তা ও শিক্ষার উৎস।
বর্তমানে মুসলিমরা যেসব আগ্রাসনের শিকার হচ্ছে, তার সবগুলোর সূত্র আমরা আধুনিক ইতিহাসের সূচনালগ্নেই খুঁজে পাব। উনবিংশ শতাব্দীর সেসব আগ্রাসন আজও বহাল আছে। বদলেছে ভাষা, পাল্টিয়েছে নাম। আগে যেটা হতো প্রাচ্যবিদের নামে, এখন সেটা চলছে গবেষকের নামে। এখন উপনিবেশের নাম হয়েছে ওয়ার অন টেরর। আমরা যদি তাদের কর্মকৌশলগুলোর বাস্তবতা বুঝতে পারি, তাহলে আল্লাহর ইচ্ছায় তাদের আগ্রাসনকে আমরা খুব সহজেই প্রতিরোধ করতে পারব। এজন্য এসব বিষয়ে

[76]. বুখারি, হাদিস: ৬১৩৩; মুসলিম, হাদিস: ২৯৯৮
[77]. আল হাশর, ৫৯:২

আমাদের দায়ীদের মাঝে যথেষ্ট সচেতনতা তৈরি করতে হবে এবং তাদের সমস্ত প্রকার আগ্রাসন নিত্রে নিজেদের মধ্যে গবেষণা চালু রাখতে হবে। আলহামদুলিল্লাহ মুসলিম উম্মাহর মাঝে আমরা সচেতনার এক জোয়ার দেখতে পাচ্ছি। এই জোয়ারকে আরও বেগবানও মজবুত করতে হবে। যেন উম্মাহ বুদ্ধিবৃত্তিক ও রাজনৈতিক সর্বপ্রকার বহিরাগত আগ্রাসন থেকে স্বাধীনতা লাভ করে দ্বীনের ছায়ায় জীবনযাপন করতে পারে। মহান আল্লাহ তাআলা আমাদের মানুষের দাসত্ব থেকে মুক্ত হয়ে তাঁর দাসরে জীবন পরিচালনার তাওফিক দান করুন। আমিন ইয়া রাব্বুল 'আলামিন।

শেষ কথা

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ ، يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَيُقِيمُونَ الصلوة وَيُؤْتُونَ الزَّكوة وَيُطِيعُونَ اللهَ وَرَسُولَهُ ، أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ وَ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

" আর ঈমানদার পুরুষ ও ঈমানদার নারী একে অপরের সহায়ক। তারা ভাল কথার শিক্ষা দেয় এবং মন্দ থেকে বিরত রাখে। নামায প্রতিষ্ঠা করে, যাকাত দেয় এবং আল্লাহ ও তাঁর রসূলের নির্দেশ অনুযায়ী জীবন যাপন করে। এদেরই উপর আল্লাহ তা'আলা দয়া করবেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ পরাক্রমশীল, সুকৌশলী।"[78]

আল্লাহ তাআলা সমগ্র সৃষ্টির স্রষ্টা এবং তিনিই মানবজাতিকে পুরুষ ও নারী—এই দুই শ্রেণিতে সৃষ্টি করেছেন। উভয়কেই তিনি নিজ নিজ মর্যাদার আসনে অধিষ্ঠিত করেছেন এবং তাদের জন্য উপযোগী অধিকার ও দায়িত্ব নির্ধারণ করেছেন। ইসলাম প্রমান করে নারী ও পুরুষ পরস্পরের প্রতিদ্বন্দ্বী নয়; বরং একে অপরের সহযোগী ও পরিপূরক। তাদের সৃষ্টির উদ্দেশ্যও এক— আল্লাহর ইবাদত করা এবং তাঁর সন্তুষ্টি অর্জন করা।

ইসলাম নারীকে কন্যা, বোন, স্ত্রী ও মাতা—প্রতিটি পরিচয়ে সম্মান, নিরাপত্তা ও অধিকার প্রদান করেছে। ইতিহাসের বিভিন্ন ধর্ম ও সভ্যতায় নারী যেখানে অবহেলা, বৈষম্য ও নির্যাতনের শিকার হয়েছে, সেখানে ইসলাম তাকে মানবিক মর্যাদার উচ্চ আসনে প্রতিষ্ঠিত করেছে। এই পুরো গবেষণায় আলোচিত বিষয়সমূহ থেকে আমরা তার'ই প্রমান পেয়েছি।

---

[78]. সূরা তাওবাহ, ৯:৭১

সব শেষে, নারীর প্রকৃত মর্যাদা, নিরাপত্তা ও কল্যাণ ইসলামের মধ্যেই নিহিত। অতএব, আমাদের কর্তব্য হলো ইসলামের সঠিক শিক্ষা গ্রহণ করা, তা নিজের জীবনে বাস্তবায়ন করা এবং সমাজের সর্বস্তরে এ বিষয়ে সচেতনতা সৃষ্টি করা। আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে সত্য উপলব্ধি করার এবং তার উপর অবিচল থাকার তাওফিক দান করুন আমীন ইয়া রাব্বুল আলামিন।

তথ্যসূত্র

১. আল- কুর'আনুল কারিম।

২. আল-হাদিস App

৩. muslimbangla.com

৪. HadithBD (https://www.hadithbd.com)

৫. বিহাইন্ড ফেমিনিজম - মারিয়াম তানহা (অনুবাদ ও সংকলন)

৬. নারীর শত্রু-মিত্র – মুহাম্মদ যাইনুল আবেদীন। (মেশক প্রকাশন)

৭. পশ্চিমা নারীদের আর্তনাত- ড. আব্দুল্লাহ আল খাতির। (সাবিল পাবলিকেশন)

৮. ডাবল স্ট্যান্ডার্ড ২- ড. শামসুল আরেফীন শক্তি। (সন্দীপন প্রকাশন)

৯. মানবসভ্যতা বিনির্মানে নারী- মুজাহিদুল ইসলাম মাইমুন। (নাশাত পাবলিকেশন)

১০. নারী স্বাধীনতার স্বরূপ- ড. ইয়াদ কুনাইবী। (শব্দতরু পাবলিকেশন)

১১. আধুনিক প্রাচ্যবাদের কবলে মুসলিম নারী সমাজ- হাসসান বিন সাবিত। (সিজদাহ পাবলিকেশন)

১২. হে বোন! কে তুমি? কি তোমার পরিচয়?- উম্মে হাবীবা রিফায়ী (মাকতাবাতুল হেরা)

১৩. মাসিক আল কাউসার।

১৪. উইকিপিডিয়া।

কৃতজ্ঞতা ♡

সবশেষে মহান আল্লাহ তা'আলার কাছে শুকরিয়া আদায় করছি। তাঁর অনুগ্রহ, তাওফিক ও সাহায্য ছাড়া এ কাজ সম্পন্ন করা আমার পক্ষে সম্ভব হতো না।

বিশেষভাবে আমার জাওযকেও অনেক অনেক জাযাকাল্লাহ। শেষ মুহূর্তে উনার সাপোর্ট আর হেল্প না থাকলে এতো অল্প সময়ে এই থিসিসের কাজ শেষ করা আমার জন্য খুব কঠিন হয়ে যেতো।

আল্লাহ ﷻ উনাকে দুনিয়া ও আখিরাতের উত্তম প্রতিদান দান করুন, উনার জীবনে রহমত ও বরকত দান করুন এবং উভয় জাহানে কল্যাণ ও সফলতা দান করুন। আমীন ইয়া রব্ব!